ভক্তদের সংসর্গ এবং তাদের কাছ থেকে সাহসের প্রশিক্ষণ লাভ করা। একেই বলে তাযকিয়া তথা পবিত্রকরণ। কোরআন এ বিষয়টিকেই রিসালতের স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করে ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। কারণ, শুধু শিক্ষা ও বাহ্যিক সভ্যতাকে প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ধর্মেই কোন-না-কোন আকারে সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ পন্থায় অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয়। প্রত্যেক ধর্ম ও সমাজে একে অন্যতম মানবিক প্রয়োজন হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে, সে নির্ভুল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা পেশ করেছে, যা মানুষ ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে এবং চমৎকার জীবনব্যবস্থা উপস্থাপিত করে। অন্যান্য জাতি ও ধর্মে এর নজীর খুঁজে পাওয়া যায় না। এর সাথে সাথে চরিত্র সংশোধন ও আত্মিক পবিত্রকরণ এমন একটি কাজ, যা অন্যান্য ধর্মে ও সম্প্রদায়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। তারা শিক্ষার ডিগ্রীকেই মানুষের যোগ্যতার মাপকাঠি মনে করে। এসব ডিগ্রীর ওজনের সাথে সাথে মানুষের ওজন বাড়ে ও কমে। ইসলাম, শিক্ষার সাথে পবিত্রকরণের বক্তব্য যোগ করে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দেখিয়েছে।

যেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে শিক্ষা অর্জন করেছেন, শিক্ষার সাথে সাথে তাঁদের আত্মিক পরিশুদ্ধিও সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে তাঁর প্রশিক্ষণাধীনে সাহাবীগণের যে একটি দল তৈরী হয়েছিল, একদিকে তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির গভীরতা ছিল বিস্ময়কর; বিশ্বের দর্শন তাঁদের সামনে হার মেনেছিল এবং অন্যদিকে তাঁদের আত্মিক পবিত্রতা, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক এবং আল্লাহ্র উপর ভরসাও ছিল অভাবনীয়। স্বয়ং কোরআন তাদের প্রশংসায় বলে ঃ

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ـ

অর্থাৎ—"যারা পয়গম্বরের সঙ্গে রয়েছে, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পর সদয়। তুমি তাদের রুকু-সিজদা করতে দেখবে। তারা আল্লাহ্র কৃপা ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে।"

এ কারণেই তাঁরা যে দিকে পা বাড়াতেন, সাফল্য ও কৃতকার্যতা তাঁদের পদ চুম্বন করত এবং আল্লাহ্র সাহায্য ও সমর্থন তাঁদের সাথে থাকত। তাঁদের বিস্ময়কর কীর্তিসমূহ আজও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার মস্তিষ্ককে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। বলা বাহুল্য, এগুলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরই ফল। বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের চিন্তা সবাই করেন। কিন্তু শিক্ষার প্রাণ সংশোধনের দিকে মোটেই মনোযোগ দেওয়া হয় না। অর্থাৎ, শিক্ষক ও গুরুর চারিত্রিক

সংশোধন এবং সংস্কারক-সুলভ প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয় না। ফলে হাজারো চেষ্টা যত্নের পরও এমন কৃতী পুরুষের সৃষ্টি হয় না, যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বলিষ্ঠতা অন্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং অন্যকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষকেরা যে ধরনের জ্ঞান ও চরিত্রের অধিকারী হবেন, তাদের শিক্ষাধীন ছাত্ররাও সে ধরনের জ্ঞান ও চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে। এ কারণে শিক্ষাকে কল্যাণকর ও উন্নত করতে হলে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন-পরিবর্ধনের চাইতে শিক্ষকদের শিক্ষাগত,কর্মগত ও চরিত্রগত অবস্থার দিকে বেশী করে নজর দেওয়া আবশ্যক।

এ পর্যন্ত নবুয়ত ও রিসালতের তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হল। পরিশেষে সংক্ষেপে আরও জানা প্রয়োজন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অর্পিত তিনটি কর্তব্য তিনি কতদূর বাস্তবায়িত করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য কতটুকু হয়েছে? এর জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, তাঁর তিরোধানের সময় সমগ্র আরব উপত্যকার ঘরে ঘরে কোরআন তিলাওয়াত হত। হাজার হাজার হাফেয ছিলেন। শত শত লোক দৈনিক অথবা প্রতি তৃতীয় দিনে কোরআন খতম করতেন। কোরআন ও হিকমত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

یتیمے کہ ناکردہ قرآن درست+ کتب خانۂ چند ملت بشست

"সেই ব্যক্তি প্রকৃত অনাথ যে ঠিকমত কোরআন পাঠে সক্ষম নয়।"

বিশ্বের সমগ্র দর্শন কোরআনের সামনে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। তওরাত ও ইন্‌জীলের বিকৃত সংকলনসমূহ গল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল, কিন্তু কোরআনের নীতিমালাকে সম্মান ও শিষ্টাচারের মানদণ্ড বলে গণ্য করা হত। অপরদিকে 'তাযকিয়া' তথা পবিত্রকরণও চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এককালের দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরাও চরিত্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠ গুরুত্ব আসনে আসীন হয়েছিলেন। চরিত্রহীনতার রোগীরা শুধু রোগমুক্তই হয়নি; সফল চিকিৎসকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। যারা দস্যু ছিল তারা পথপ্রদর্শক হয়ে গেল। মূর্তিপূজারীরা মূর্তমান ত্যাগ ও সহানুভূতিশীল হয়ে গিয়েছিল। কঠোরতা ও যুদ্ধলিপ্সার স্থলে নম্রতা ও পারস্পরিক শান্তি বিরাজমান ছিল। এক সময় ডাকাতিই যাদের পেশা ছিল, তারাই মানুষের ধন-সম্পদের রক্ষকে পরিণত হয়েছিল।

মোটকথা, হযরত খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর দোয়ার ফলে যে তিনটি কর্তব্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অর্পিত হয়েছিল, তাতে তিনি স্বীয় জীবদ্দশায়ই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর সহচরগণ এগুলোকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে তথা সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত করে দেন।

فصلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا بعدد من صلى وصام وقعد وقام -

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ
اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾
اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾
وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى
لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

(১৩০) ইবরাহীমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফেরায়? কিন্তু সে ব্যক্তি যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং সে পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (১৩১) স্মরণ কর, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন ঃ অনুগত হও। সে বলল ঃ আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম। (১৩২) এরই ওছিয়ত করেছে ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না।

سفه نفسه এখানে سفه অর্থ অজ্ঞতা/বিখ্যাত পণ্ডিত ফাররা তাই বলেছেন। হযরত শায়খুল হিন্দ (র) এ মতই অবলম্বন করেছেন। সুতরাং প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী سفه نفسه অর্থ হবে যে, নিজের সত্তাগতভাবে নির্বোধ। এটাই তফসীরের সার-সংক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা মোতাবেক অর্থ হবে এই যে, ইবরাহীমী মিল্লাত থেকে সে-ই বিমুখতা অবলম্বন করতে পারে, যে মনস্তাত্ত্বিকভাবেও মূর্খ হবে। অর্থাৎ নিজের সত্তা সম্পর্কেও যার কোন জ্ঞান নেই—অর্থাৎ আমি কে বা কি, সে সম্বন্ধে সে অজ্ঞ। কয়েকটা জাতির গ্রন্থাগার আয়ত্ত করার পরও তার সে এতীমী ঘুচে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইবরাহীমের ধর্ম থেকে ঐ ব্যক্তিই মুখ ফেরাবে, যে নিজের সম্পর্কে বোকা। (এমন ধর্ম বর্জনকারীকে বোকাই বলা হবে। এ ধর্মের অবস্থা এই যে, এর কারণেই) আমি তাকে (অর্থাৎ, ইবরাহীম [আ]-কে রসূল পদের জন্যে) পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং (এরই কারণে) সে পরকালে অন্যান্য যোগ্য লোকের অন্তর্ভুক্ত (যারা সবকিছুই পাবে। রসূল পদের জন্য এ মনোনয়ন তখন হয়েছিল,) যখন তার পালনকর্তা (ইল্হামের মাধ্যমে) তাকে বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য অবলম্বন কর। তিনি বললেন, আমি বিশ্ব-পালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম। (এহেন আনুগত্য অবলম্বনের ফলে আমি তাকে নবুয়তের মর্যাদা দান করলাম। তা তখনই হোক কিংবা কিছুদিন পর। বর্ণিত ধর্মের উপর কায়েম থাকার নির্দেশ ইবরাহীম তদীয় সন্তানদের দিয়েছেন এবং ইয়াকুবও (তাই করেছেন)। (নির্দেশের ভাষা ছিল এই,) হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (ইসলাম ও আল্লাহ্র আনুগত্যের) এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা (মৃত্যু পর্যন্ত একে পরিত্যাগ করো না এবং) ইসলাম ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইবরাহীমী ধর্মের মৌলিক নীতিমালা, তার অনুসরণের তাগীদ এবং তা থেকে বিমুখতার অনিষ্টতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, এতে ইবরাহীমী ধর্মের অনুসরণ সম্পর্কে ইহুদী ও খৃস্টানদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। একমাত্র ইসলামই যে ইবরাহীমী ধর্মের অনুরূপ এবং ইসলাম যে সকল পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম—এসব বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে সন্তানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের প্রতি পয়গম্বরগণের বিশেষ মনোযোগের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতে ইবরাহীমী দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর দৌলতেই ইহকাল ও পরকালে ইবরাহীম (আ)-এর সম্মান লাভের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এ ধর্ম থেকে বিমুখ হয় সে নির্বোধদের স্বর্গে বাস করে।

—وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ

অর্থাৎ—ইবরাহীমী ধর্ম থেকে সে ব্যক্তিই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, যার বিন্দুমাত্রও বোধশক্তি নেই। কারণ, এ ধর্মটি হুবহু স্বভাব-ধর্ম। কোন সুস্থ-স্বভাব ব্যক্তি এ ধর্মকে অস্বীকার করতে পারে না। পরবর্তী আয়াতে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ এতেই এ ধর্মের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যায় যে আল্লাহ্ তা'আলা এ ধর্মের দৌলতেই হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ইহকালে সম্মান ও মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং পরকালেও। ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্য সারা বিশ্বই প্রত্যক্ষ করেছে। নমরূদের মত পরাক্রমশালী

সম্রাট ও তার পারিষদবর্গ এই মহাপুরুষের একার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, ক্ষমতার যাবতীয় কলা-কৌশল তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে এবং সর্বশেষে ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে তাঁকে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু জগতের যাবতীয় উপাদান ও শক্তি যে অসীম ক্ষমতা বানের আজ্ঞাধীন, তিনি নমরূদের সমস্ত পরিকল্পনাকে ধূলিসাৎ করে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রচণ্ড আগুনকেও স্বীয় দোস্তের জন্য পুষ্পোদ্যানে পরিণত করে দিলেন। ফলে বিশ্বের সমগ্র জাতি তাঁর অপরিসীম মাহাত্ম্যের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হল। বিশ্বের সমস্ত মু'মিন ও কাফির, এমনকি পৌত্তলিকেরাও এ মূর্তি সংহারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে। আরবের মুশরিকরা আর যাই হোক, হযরত ইবরাহীমেরই সন্তান-সন্ততি ছিল। এ কারণে মূর্তিপূজা সত্ত্বেও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্মান ও মাহাত্ম্য মনেপ্রাণে স্বীকার করত এবং তাঁরই ধর্ম অনুসরণের দাবী করত। ইবরাহীমী ধর্মের কিছু অস্পষ্ট চিহ্ন তাদের কাজেকর্মেও বিদ্যমান ছিল। হজ্ব, ওমরা, কোরবানী ও অতিথিপরায়ণতা এ ধর্মেরই নিদর্শন। তবে তাদের মূর্খতার কারণে এগুলো বিকৃত হয়ে পড়েছিল। বলা বাহুল্য, এটা ঐ নেয়ামতেরই ফলশ্রুতি—যার দরুন খলীলুল্লাহ্ (আ)-কে 'মানব নেতা' উপাধি দেওয়া হয়েছিল ঃ

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

ইবরাহীম (আ) ও তাঁর ধর্মের অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য ছাড়াও এ ধর্মের জনপ্রিয়তা ও স্বভাবধর্ম হওয়ার বিষয়টি সারা দুনিয়ার সামনে প্রতিভাত হয়ে গেছে। ফলে যার মধ্যে এতটুকুও বোধশক্তি ছিল, সে এ ধর্মের সামনে মাথা নত করেছিল।

এই ছিল ইবরাহীম (আ)-এর ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা। পারলৌকিক ব্যাপারটি আমাদের সামনে উপস্থিত নেই, কিন্তু কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা কোরআনের সে আয়াতেই ফুটে উঠেছে, যাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহকালে তাঁকে যেমন সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তেমনি পরকালেও তাঁর উচ্চাসন নির্ধারিত রয়েছে।

ইবরাহীমী ধর্মের মৌলনীতি আল্লাহ্র আনুগত্য শুধু ইসলামেই সীমাবদ্ধ ঃ অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে ইবরাহীমী ধর্মের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

অর্থাৎ— 'ইবরাহীম (আ)-কে যখন তাঁর পালনকর্তা বললেন, "আনুগত্য অবলম্বন কর, তখন তিনি বললেন, আমি বিশ্বপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম।' এ বর্ণনাভঙ্গিতে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্ তা'আলার أَسْلِمْ (আনুগত্য অবলম্বন কর।) সম্বোধনের উত্তরে সম্বোধনেরই ভঙ্গিতে أَسْلَمْتُ لَكَ

(আমি আপনার আনুগত্য অবলম্বন করলাম) বলা যেত, কিন্তু হযরত খলীল (আ) এ ভঙ্গি ত্যাগ করে أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ বলেছেন। অর্থাৎ আমি বিশ্ব-পালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম। কারণ, প্রথমত এতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্‌র স্থানোপযোগী গুণকীর্তনও করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এ বিষয়টিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আমি আনুগত্য অবলম্বন করে কারো প্রতি অনুগ্রহ করিনি; বরং এমন করাই ছিল আমার জন্য অপরিহার্য। কারণ, তিনি রাব্বুল-আলামীন—সারা জাহানের পালনকর্তা। তাঁর আনুগত্য না করে বিশ্ব তথা বিশ্ববাসীর কোনই গত্যন্তর নেই। যে আনুগত্য অবলম্বন করে, সে স্বীয় কর্তব্য পালন করে লাভবান হয়। এতে আরও জানা যায় যে, ইবরাহীমী ধর্মের মৌলনীতির যথার্থ ও স্বরূপ এক 'ইসলাম' শব্দের মধ্যেই নিহিত—যার অর্থ আল্লাহ্‌র আনুগত্য। ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের সারমর্মও তাই। ঐসব পরীক্ষার সারমর্মও তাই, যাতে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহ্‌র এ দোস্ত মর্যাদার উচ্চতর শিখরে পেঁৗছেছেন। ইসলাম তথা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের খাতিরেই সমগ্র সৃষ্টি। এরই জন্য পয়গম্বরগণ প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করা হয়েছে।

এতে আরও বোঝা যায় যে, ইসলামই সমস্ত পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত রসূল ইসলামের দিকেই মানুষকে আহবান করেছেন এবং তাঁরা এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে পরিচালনা করেছেন। কোরআন স্পষ্ট ভাষায় বলেছে ঃ

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

"ইসলামই আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে, তা কখনও কবুল করা হবে না।"

জগতে পয়গম্বরগণ যত ধর্ম এনেছেন, নিজ নিজ সময়ে সে সবই আল্লাহ্‌র কাছে মকবুল ছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে সেসব ধর্মও ছিল ইসলাম—যদিও সেগুলো বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। যেমন, মূসা (আ)-র ধর্ম, ঈসা (আ)-র ধর্ম, তথা ইহুদী ধর্ম, খৃস্ট ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু এসব ধর্মের স্বরূপ ছিল ইসলাম, যার মর্ম আল্লাহ্‌র আনুগত্য। তবে এ ব্যাপারে ইবরাহীমী ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজ ধর্মের নাম 'ইসলাম' রেখেছিলেন এবং স্বীয় উম্মতকে 'উম্মতে-মুসলিমাহ্' নামে অভিহিত করেছিলেন। তিনি দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

অর্থাৎ—"হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উভয়কে (ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে) মুসলিম (অর্থাৎ আনুগত্যশীল) কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও এক দলকে আনুগত্যকারী কর।" হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর সন্তানদের প্রতি ওসীয়ত প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ—তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া অন্য ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করো না।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পর তাঁরই প্রস্তাবক্রমে মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মত এ বিশেষ নাম লাভ করেছে। ফলে এ উম্মতের নাম হয়েছে 'মুসলমান'। এ উম্মতের ধর্মও 'মিল্লাতে-ইসলামিয়াহ্' নামে অভিহিত।

কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ - مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا

"এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনিই ইতিপূর্বে তোমাদের 'মুসলমান' নামকরণ করেছেন এবং এতেও (অর্থাৎ কোরআনেও) এ নামই রাখা হয়েছে।"

ধর্মের কথা বলতে গিয়ে ইহুদী, খৃস্টান এবং আরবের মুশরিকরাও বলে যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী, কিন্তু এসব তাদের ভুল ধারণা অথবা মিথ্যা দাবী মাত্র। বাস্তবে মুহাম্মদী ধর্মই শেষ যমানায় ইবরাহীমী ধর্ম তথা স্বভাব-ধর্মের অনুরূপ।

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যত পয়গম্বর আগমন করেছেন এবং যত আসমানী গ্রন্থ ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে ইসলাম তথা আল্লাহ্র আনুগত্য। এ আনুগত্যের সারমর্ম হল রিপুর কামনা-বাসনার বিপরীতে আল্লাহ্র নির্দেশের আনুগত্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ ত্যাগ করে হেদায়েতের অনুসরণ।

পরিতাপের বিষয়, আজ ইসলামের নাম উচ্চারণকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমান এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা ধর্মের নামেও স্বীয় কামনা-বাসনারই অনুসরণ করতে

চায়। কোরআন ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যাই তাদের কাছে পছন্দ, যা তাদের কামনা-বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা শরীয়তের জামাকে টেনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের কামনার মূর্তিতে পরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে—যাতে বাহ্যদৃষ্টিতে শরীয়তেরই অনুসরণ করছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কামনারই অনুসরণ।

গাফেলরা জানে না যে, এসব অপকৌশল ও অপব্যাখ্যার দ্বারা সৃষ্টিকে প্রতারিত করা গেলেও স্রষ্টাকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর জ্ঞান প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। তিনি মনের গোপন ইচ্ছা ও ভেদকে পর্যন্ত দেখেন ও জানেন। তাঁর কাছে খাঁটি আনুগত্য ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণীয় নয়।

কোন্ কাজে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন এবং আমার জন্য তাঁর নির্দেশ কি? খাহেশ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে এসব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করাই সত্যিকার ইসলাম। আল্লাহ্ কোন্ দিকে যেতে বলেন এবং কোন্ কাজের নির্দেশ দেন, তা শোনার জন্য আজ্ঞাবহ গোলামের মত সদা উৎকর্ণ থাকা উচিত। কাজটি কিভাবে করলে আল্লাহ কবুল করবেন এবং সন্তুষ্ট হবেন—এসব চিন্তা করাই প্রকৃত ইবাদত ও বন্দেগী।

আনুগত্য ও মহব্বতের এই যে প্রেরণা, এর পূর্ণতাই মানুষের উন্নতির সর্বশেষ স্তর। এ স্তরকেই 'মাকামে-আবদিয়্যাত' তথা দাসত্বের স্তর বলা হয়। এখানে পৌঁছেই হযরত ইবরাহীম (আ) 'খলীল' উপাধি লাভ করেছিলেন এবং মহানবী (সা) عبدنا (আমার দাস) উপাধিতে ভূষিত হন। এ স্তরের নীচেই রয়েছে আউলিয়া ও কুতুবদের স্তর। এটাই সত্যিকার তওহীদ, যা অর্জিত হলে মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, কারও কাছে কিছু আশা করে না।

মোটকথা, ইসলামের অর্থ ও স্বরূপ হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্য। এ আনুগত্যের পথ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্ অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ সম্পর্কে কোরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ط

—"আপনার পালনকর্তার কসম, তারা কখনও ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না তারা আপনাকে নিজেদের কলহ-বিবাদে বিচারক নিযুক্ত করে, অতঃপর আপনার সিদ্ধান্ত ও মীমাংসাকে খোলা ও সরল মনে স্বীকার করে নেয়।"

উল্লিখিত আয়াতে ইবরাহীম (আ) সন্তানদের ওসীয়ত করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন অবস্থায়, অন্য কোন ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করবে না। অর্থাৎ ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন করতে থাকবে, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মৃত্যুও ইসলামের উপরই দান করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা জীবনে যে অবস্থাকে আঁকড়ে থাকবে, তোমাদের মৃত্যুও সে অবস্থাতেই হবে এবং হাশরের ময়দানেও সে অবস্থাতেই উপস্থিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন রীতিও তাই। যে বান্দা সৎকর্মের ইচ্ছা করে এবং সেজন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সে কর্মেরই সামর্থ্য দান করেন এবং তার জন্য তা সহজ করে দেন।

এক্ষেত্রে অপর এক হাদীস থেকে বাহ্যত এর বিপরীত অর্থও বোঝা যায়। তাতে বলা হয়েছে, "কেউ কেউ জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের কাজ করতে করতে জান্নাতের নিকটবর্তী হয়ে যায়, যখন জান্নাত এবং তার মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান থাকে, তখন তার ভাগ্য বিরূপ হয়ে ওঠে। ফলে সে দোযখীদের মত কাজ করতে আরম্ভ করে; পরিণামে সে দোযখে প্রবেশ করে। এমনিভাবে কেউ কেউ সারা জীবন দোযখের কাজে লিপ্ত থাকে, দোযখ এবং তার মাঝে যখন এক হাতের ব্যবধান থাকে, তখন তার ভাগ্য প্রসন্ন হয়ে ওঠে। ফলে সে জান্নাতীদের মত কাজ করতে আরম্ভ করে; পরিণামে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।" প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসটি বিপরীত অর্থ বোঝায় না; কারণ, কোন কোন জায়গায় এ হাদীসেই فيما يبد و للناس কথাটি যুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সারা জীবন জান্নাতের কাজ করে অবশেষে দোযখের কাজে লিপ্ত হয়, প্রকৃতপক্ষে পূর্বেও সে দোযখের কাজেই লিপ্ত থাকে, কিন্তু বাহ্য-দৃষ্টিতে মানুষ তাকে জান্নাতের কাজে লিপ্ত মনে করে। এমনিভাবে, যে ব্যক্তি সারা জীবন দোযখের কাজে লিপ্ত থাকে এবং অবশেষে জান্নাতের কাজ করতে থাকে, সেও প্রকৃতপক্ষে পূর্বেও জান্নাতের কাজই করে থাকে, কিন্তু মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা দোযখের কাজ বলে মনে হয়।---(ইবনে-কাসীর)

মোটকথা, যে ব্যক্তি সারা জীবন সৎকাজে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহর ওয়াদা ও রীতি অনুযায়ী আশা করা দরকার যে, তার মৃত্যুও সৎকাজের মধ্যেই হবে।

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ
مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

(১৩৩) তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বলল ঃ আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বললো, আমরা তোমার, তোমার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের প্রভুর ইবাদত করব। তিনি একক উপাস্য। (১৩৪) আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। তারা ছিল এক সম্প্রদায়—যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্য। তারা কি করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তোমরা কোন নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ উদ্ধৃতির মাধ্যমে উপরোক্ত দাবী করছ, না) তোমরা (স্বয়ং তখন সেখানে) উপস্থিত ছিলে. যখন ইয়াকুবের অন্তিম সময় নিকটবর্তী হয়? (এবং) যখন তিনি সন্তানদের (অঙ্গীকার নবায়নের জন্য) বলেন, তোমরা আমার (মৃত্যুর) পরে কিসের ইবাদত করবে? (তখন) তারা সর্বসম্মতিক্রমে উত্তর দেয় ঃ আমরা (সেই পবিত্র সত্তারই) ইবাদত করব, যার ইবাদত তুমি, তোমার পিতৃপুরুষ (হযরত) ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক করে এসেছেন। (অর্থাৎ) সেই প্রভুর, যিনি এক ও অদ্বিতীয়। আমরা (বিধি-বিধানে) তাঁর আনুগত্যের উপর (কায়েম) থাকব। তারা ছিল (সে সব পূর্ব-পুরুষের) এক সম্প্রদায়, যারা (নিজ নিজ যমানায়) গত হয়েছেন। তাদের কর্ম তাদের কাজে আসবে এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের কাজে আসবে। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাও করা হবে না। (শুধু শুধু আলোচনাও হবে না—তা দ্বারা তোমাদের উপকার তো দূরের কথা।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর ধর্ম ইসলামের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, ইবরাহীমের ধর্ম বলুন, আর ইসলামই বলুন, তা সমগ্র জাতি বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যই এক অনন্য নির্দেশনামা। এমতাবস্থায় আয়াতে যে বিশেষভাবে ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আ) কর্তৃক সন্তানদের সম্বোধন করার কথা বলা হয়েছে এবং উভয় মহাপুরুষ ওসীয়তের

মাধ্যমে স্বীয় সন্তানদেরকে যে ইসলামে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ কি ?

উত্তর এই যে, এতে বোঝা যায় যে, সন্তানের ভালবাসা ও মঙ্গলচিন্তা রিসালত এমনকি বন্ধুত্বের স্তরেরও পরিপন্থী নয়। আল্লাহ্‌র বন্ধু, যিনি এক সময় পালনকর্তার ইঙ্গিতে স্বীয় আদরের দুলালকে কোরবানী করতে কোমর বেঁধেছিলেন, তিনিই অন্য সময় সন্তানের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য তাঁর পালনকর্তার দরবারে দোয়াও করেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সন্তানকে এমন বিষয় দিয়ে যেতে চান, যা তাঁর দৃষ্টিতে সর্ববৃহৎ নেয়ামত অর্থাৎ, ইসলাম। উল্লেখিত আয়াত وَوَصّٰى আর আয়াত اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ بِهَا اِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ এর সারমর্মও তাই। পার্থক্য এতটুকু যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নেয়ামত ও ধন-সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার ধ্বংসশীল ও নিকৃষ্ট বস্তু নিয়ে। অথচ পয়গম্বরগণের দৃষ্টি অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের কাছে প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম তথা ইসলাম।

সাধারণ মানুষ মৃত্যুর সময় সন্তানকে বৃহত্তম ধন-সম্পদ দিয়ে যেতে চায়। আজকাল একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী কামনা করে—তার সন্তান মিল-ফ্যাক্টরীর মালিক হোক, আমদানী ও রফতানীর বড় বড় লাইসেন্স লাভ করুক, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স গড়ে তুলুক। একজন চাকরিজীবী চায়—তার সন্তান উচ্চপদ ও মোটা বেতনে চাকরি করুক। অপরদিকে একজন শিল্পপতি মনে-প্রাণে কামনা করে—তার সন্তান শিল্পক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করুক। সে সন্তানকে সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ কলাকৌশল বলে দিতে চায়।

এমনিভাবে পয়গম্বর এবং তাঁদের অনুসারী ওলীগণের সর্ববৃহৎ বাসনা থাকে, যে বস্তুকে তাঁরা সত্যিকার চিরস্থায়ী এবং অক্ষয় সম্পদ মনে করেন, তা সন্তানরাও পুরোপুরিভাবে লাভ করুক। এজন্যই তাঁরা দোয়া করেন এবং চেষ্টাও করেন। অন্তিম সময়ে এরই জন্য ওসীয়ত করেন।

ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষাদানই সন্তানের জন্য বড় সম্পদ ঃ পয়গম্বরগণের এই বিশেষ আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যও একটি নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, তারা যেভাবে সন্তানদের লালন-পালন ও পার্থিব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে, সেভাবে, বরং তার চাইতেও বেশী তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা

করা দরকার। মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক। এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকার ভালবাসা ও প্রকৃত শুভেচ্ছা নিহিত। এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, সন্তানকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু চিরস্থায়ী অগ্নি ও আযাবের কবল থেকে রক্ষা করার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না। সন্তানের দেহ থেকে কাঁটা বের করার জন্য সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে বন্দুকের গুলী থেকে রক্ষা করবে না।

পয়গম্বরদের এ কর্মপদ্ধতি থেকে আরও একটি মৌলিক বিষয় জানা যায় যে, সর্বপ্রথম সন্তানদের মঙ্গলচিন্তা করা এবং এরপর অন্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া পিতামাতার কর্তব্য। পিতামাতার নিকট থেকে এটাই সন্তানদের প্রাপ্য। এতে দু'টি রহস্য নিহিত রয়েছে—প্রথমত, প্রাকৃতিক ও দৈহিক সম্পর্কের কারণে তারা পিতামাতার উপদেশ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করবে। অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে তারা পিতামাতার সাহায্যকারী হতে পারবে।

দ্বিতীয়ত, এটাই সত্য প্রচারের সবচাইতে সহজ ও উপযোগী পথ যে, প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের সংশোধনের কাজে মনেপ্রাণে আত্মনিয়োগ করবে। এভাবে সত্য প্রচার ও সত্য শিক্ষার কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে পরিবারের লোকজনের শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র জাতিরও শিক্ষা হয়ে যায়। এ সংগঠন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কোরআন বলে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

—"হে মু'মিনগণ, নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর।"

মহানবী (সা) ছিলেন সারা বিশ্বের রসূল। তাঁর হেদায়েত কিয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য ব্যাপক। তাঁকেও সর্বপ্রথম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (নিকট-আত্মীয়দেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন)। আরও বলা হয়েছে ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا অর্থাৎ—পরিবার-পরিজনকে নামায পড়ার নির্দেশ দিন এবং নিজেও নামায অব্যাহত রাখুন।

মহানবী (সা) সর্বদাই এ নির্দেশ পালন করেছেন।

তৃতীয়ত, আরও একটি রহস্য এই যে, কোন মতবাদ ও কর্মসূচীতে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন সহযোগী ও সমমনা না হলে সে মতবাদ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ কারণেই প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা)-র প্রচারকার্যের জওয়াবে সাধারণ লোকদের উত্তর ছিল যে, প্রথমে আপনি নিজ গোত্র কোরায়েশকে ঠিক করে নিন; এরপর আমাদের কাছে আসুন। হুযুর (সা)-এর পরিবারে যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করল এবং মক্কা বিজয়ের সময় তা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করল, তখন এর প্রতিক্রিয়া কোরআনের ভাষায় এরূপ প্রকাশ পেল--- يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا অর্থাৎ—মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে।

আজকাল ধর্মহীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে, তার বড় কারণ এই যে, পিতামাতা নিজ ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী ও ধার্মিক হলেও সন্তানদের ধার্মিক হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করে না। সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টি সন্তানের পার্থিব ও স্বল্পকালীন আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দিই না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে তওফীক দিন, যাতে আমরা আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হই এবং নিজের ও সন্তানদের জন্য ঈমান ও নেক আমলকে সর্ববৃহৎ পুঁজি মনে করে তা অর্জনে চেষ্টিত হই।

দাদার উত্তরাধিকার সম্পর্কিত একটি মাস'আলা ঃ আয়াতে ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানদের পক্ষ থেকে উত্তরে إِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ (আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ্) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দাদাকেও পিতা বলা হয় এবং দাদা ও পিতার একই হুকুম। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াতদৃষ্টে বলেছেন যে উত্তরাধিকার স্বত্বে দাদাও পিতার মত সম-অংশীদার।

বাপ-দাদার কৃতকর্মের ফলাফল সন্তানরা ভোগ করবে না ঃ لَهَا مَا كَسَبَتْ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, বাপ-দাদার সৎকর্ম সন্তানদের উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা সৎকর্ম সম্পাদন করবে। এমনিভাবে বাপ-দাদার কুকর্মের শাস্তিও সন্তানরা ভোগ করবে না, যদি তারা সৎকর্মশীল হয়। এতে বোঝা যায় যে, মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সাবালক হওয়ার পূর্বে মারা গেলে পিতামাতার কুফর ও শিরকের কারণে তারা শাস্তি ভোগ করবে না। এতে ইহুদীদের সে দাবীও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল যে, আমরা যা ইচ্ছা তা-ই করব, আমাদের বাপ-দাদার সৎকর্মের দ্বারাই আমাদের মাগফেরাত হয়ে যাবে। আজকাল সৈয়দ পরিবারের কিছু লোকও এমনি বিভ্রান্তিতে লিপ্ত যে, আমরা রসূলের আওলাদ। আমরা যা-ই করি না কেন, আমাদের মাগফেরাত হয়েই যাবে।

কোরআন এ বিষয়টি বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا (প্রত্যেকের আমলের দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে)। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (কিয়ামতের দিন একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না।) রসূলুল্লাহ্ (সা) বলছেন ঃ

হে বনী-হাশেম! এমন যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোক নিজ নিজ সৎকর্ম নিয়ে আসবে আর তোমরা আসবে সৎকর্ম থেকে উদাসীন হয়ে শুধু বংশ গৌরব নিয়ে এবং আমি বলব যে, আল্লাহ্র আযাব থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না। অন্য এক হাদীসে আছে ঃ مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (আমল যাকে পেছনে ফেলে দেয়, বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারে না।

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ۭ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ۭ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۡ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

(১৩৫) তারা বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খৃস্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। আপনি বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা ইবরাহীমের ধর্মে আছি. যাতে বক্রতা নেই। সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১৩৬) তোমরা বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর ঈমান এনেছি। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (ইহুদী ও খৃস্টানরা মুসলমানদের) বলেঃ তোমরা ইহুদী হয়ে যাও (এটা ইহুদীদের কথা) অথবা খৃস্টান হয়ে যাও (এটা খৃস্টানদের উক্তি), তবে তোমরাও সুপথ পাবে। (হে মুহাম্মদ,) আপনি (উত্তরে) বলে দিনঃ আমরা (ইহুদী অথবা খৃস্টান কখনও হব না) বরং ইবরাহীমের ধর্মে (অর্থাৎ ইসলামে) থাকব---যাতে নামমাত্রও বক্রতা নেই। (এর বিপরীতে ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদে তা রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে বক্রতা রয়েছে।) ইবরাহীম (আ) মুশরিকও ছিলেন না। (মুসলমানগণ, ইহুদী ও খৃস্টানদের উত্তরে তোমরা যে সংক্ষেপে বলেছ যে, ইবরাহীমের ধর্মেই থাকবে, এখন এ ধর্মের বিবরণ দান প্রসঙ্গে) তোমরা বলঃ (এ ধর্মে থাকার তাৎপর্য এই যে,) আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং (ঐ নির্দেশের উপরও) যা আমাদের প্রতি (রসূলের মাধ্যমে) অবতীর্ণ হয়েছে এবং (ঐ নির্দেশ ও মো'জেযার উপরও) যা হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (আ) ও তদীয় বংশধরদের (মধ্যে যারা পয়গম্বর ছিলেন, তাদের) প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং (ঐ নির্দেশ ও মো'জেযার উপরও) যা হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-কে প্রদান করা হয়েছে এবং (ঐ নির্দেশের উপরও) যা অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে। (আমরা তৎসমুদয়ের উপরই ঈমান রাখি। ঈমানও এমনভাবে যে,) আমরা তাঁদের মধ্যে (কোন একজনের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে অন্যজন থেকে) পার্থক্য করি না (যে একজনের প্রতি ঈমান আনব, আরেকজনের প্রতি আনব না।) আমরা আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্যশীল (তিনি 'ধর্ম' বলে দিয়েছেন, আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা যে ধর্মে আছি, তার সারমর্ম তা-ই। কারও পক্ষে একে অস্বীকার করার অবকাশ নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআন ইয়াকুব (আ)-এর বংশধরকে اسباط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এটা سبط এর বহুবচন। এর অর্থ গোত্র ও দল। তাদের سبط বলার কারণ এই যে, হযরত ইয়াকুব (আ)-এর ঔরসজাত পুত্রদের সংখ্যা ছিল বার জন। পরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা এক-একটি গোত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বংশে বিশেষ বরকত দান করেছিলেন। তিনি যখন হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাছে মিসরে যান, তখন তাঁরা ছিলেন বার ভাই। পরে ফেরাউনের সাথে মুকাবিলার পর মূসা (আ) যখন মিসর থেকে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে বের হলেন, তখন তাঁর সাথে ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান হাজার হাজার সদস্যের সমন্বয়ে একটি গোত্র ছিল। তাঁর বংশে আল্লাহ্ তা'আলা আরও একটি বরকত দান করেছেন এই যে, দশজন নবী ছাড়া সব নবী ও রসূল ইয়াকুব (আ)-এর বংশধরের মধ্যেই পয়দা হয়েছেন। বনী ইসরাঈল ছাড়া অবশিষ্ট পয়গম্বরগণ হলেন আদম (আ)-এর পর হযরত নূহ (আ), শোয়াইব (আ), হুদ (আ), সালেহ (আ), লূত (আ), ইবরাহীম (আ), ইসহাক (আ), ইয়াকুব (আ), ইসমাঈল (আ) ও মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾
صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ
عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾

(১৩৭) অতএব তারা যদি ঈমান আনে তোমাদের ঈমান আনার মত, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (১৩৮) আমরা আল্লাহ্র রঙ গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্র রঙ-এর চাইতে উত্তম রঙ আর কার হ'তে পারে? আমরা তাঁরই ইবাদত করি।

অভিধান ও অলংকার

اَلشِّقَاقُ —বায়দাভী বলেন, এটা হল বিরোধ ও শত্রুতা। সুতরাং সমস্ত বিরোধীই তাদের নিজ নিজ অবস্থানে বিদ্যমান। اَلصِّبْغَةُ — شق-'সিবগুন' থেকে উদ্ভূত। صبغ হল রঙের দরুন এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় প্রত্যাবর্তন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতএব, (পূর্ববর্তী বর্ণনায় যখন সত্যধর্ম ইসলামেই সীমাবদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে, তখন) যদি তারাও (ইহুদী ও খৃস্টানরাও) তেমন ঈমান আনে, যেমন তোমরা (মুসলমানরা) ঈমান এনেছ, তবে তারাও সুপথ পাবে। আর যদি তারা (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (তোমরা তাদের বিমুখতায় বিস্মিত হয়ো না। কারণ,) তারা (সর্বদাই) বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত রয়েছে। এখন (তাদের বিরুদ্ধাচরণের ফলে কোনরূপ বিপদাশঙ্কা থাকলে জেনে নিন,) আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট। (আপনার ও তাদের কথাবার্তা) তিনি শ্রবণ করেন এবং (আপনার ও তাদের আচরণ) জানেন (আপনার চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না)।

(হে মুসলমানগণ! বলে দাও যে, ইতিপূর্বে তোমাদের উত্তরে আমরা বলেছিলাম, 'আমরা ইবরাহীমের ধর্মে আছি'-এর স্বরূপ এই যে,) আমরা (ধর্মের) ঐ অবস্থায় থাকব, যাতে আল্লাহ্ আমাদের রাঙিয়ে দিয়েছেন (এবং তা রঙের মত আমাদের শিরা-উপশিরায় ভরে দিয়েছেন)। অন্য আর কে আছে, যার রাঙিয়ে দেওয়ার অবস্থা আল্লাহ্র (রাঙিয়ে দেওয়ার অবস্থার) চাইতে উত্তম হবে? (অন্য কেউ যখন এমন নেই, তখন আমরা অন্য কারও ধর্ম অবলম্বন করিনি এবং এ কারণেই) আমরা তাঁরই দাসত্ব অবলম্বন করেছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ঈমানের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যাখ্যা ঃ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ

(যদি তারা তদ্রূপ ঈমান আনে, যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ)---সূরা বাক্কারার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ঈমানের স্বরূপ কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। কেননা, 'তোমরা ঈমান এনেছ' বাক্যে রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে-কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতে তাঁদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। যে ঈমান ও বিশ্বাস এ থেকে চুল পরিমাণও ভিন্ন; তা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

এর ব্যাখ্যা এই যে, যে সব বিষয়ের উপর তাঁরা ঈমান এনেছেন তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারবে না। তাঁরা যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ঈমান এনেছেন, তাতেও প্রভেদ থাকতে পারবে না। নিষ্ঠায় পার্থক্য হলে তা 'নিফাক' তথা কপট বিশ্বাসে পর্যবসিত হবে। আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী, ফেরেশতা, নবী-রসূল, আল্লাহ্র কিতাব ও এ সবের শিক্ষা সম্বন্ধে যে ঈমান ও বিশ্বাস রসূলুল্লাহ্ (সা) অবলম্বন করেছেন, একমাত্র তাই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য। এ সবের বিপরীত ব্যাখ্যা করা অথবা ভিন্ন অর্থ নেওয়া আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ফেরেশতা ও নবী-রসূলগণের যে মর্তবা, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারিত হয়েছে, তা হ্রাস করা অথবা বাড়িয়ে দেওয়াও ঈমানের পরিপন্থী।

এ ব্যাখ্যার ফলে কতিপয় ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ঈমানের ত্রুটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা ঈমানের দাবীদার; কিন্তু ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঈমানের মৌখিক দাবী মূর্তিপূজক, মুশরিক, ইহুদী, খৃস্টানরাও করত এবং এর প্রতিটা যুগে ধর্মভ্রষ্ট বিপথ-গামীরাও করছে। যেহেতু আল্লাহ্, রসূল, ফেরেশতা, কিয়ামত-দিবস ইত্যাদির প্রতি তাদের ঈমান তেমন নয়, যেমন রসূলুল্লাহ (সা)-এর ঈমান, এ কারণে আল্লাহ্র কাছে ধিক্কৃত ও গ্রহণের অযোগ্য।

ফেরেশতা ও রসূলের মহত্ত্ব ও ভালবাসার ভারসাম্য বজায় রাখা কর্তব্য, বাড়াবাড়ি পথভ্রষ্টতা ঃ মুশরিকদের কেউ কেউ ফেরেশতাদের অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না, আবার কেউ কেউ তাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে মনে করে ! بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ বলে উপরোক্ত উভয় প্রকার বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। ইহুদী ও খৃস্টানদের কোন কোন দল পয়গম্বরদের অবাধ্যতা করেছে। এমনকি কোন কোন পয়গম্বরকে হত্যাও করেছে। পক্ষান্তরে কোন কোন দল পয়গম্বরদের সম্মান ও মহত্ত্ব বৃদ্ধি করতে গিয়ে তাঁদের 'খোদা' অথবা 'খোদার পুত্র' অথবা খোদার সমপর্যায়ে নিয়ে স্থাপন করেছে। এ উভয় প্রকার ত্রুটি ও বাড়াবাড়িকেই পথভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ইসলামী শরীয়তে রসূলের মহত্ত্ব ও ভালবাসা ফরয তথা অপরিহার্য কর্তব্য। এ ছাড়া ঈমানই শুদ্ধ হয় না। কিন্তু রসূলকে এলেম, কুদরত ইত্যাদি গুণে আল্লাহ্‌র সমতুল্য মনে করা পথভ্রষ্টতা ও শিরক। কোরআনে শিরকের স্বরূপ সেরূপই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, কোন সিফাত তথা গুণে বা বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অন্যকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য মনে করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থও তাই। আজকাল কোন কোন মুসলমান রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'আলেমুল-গায়েব' 'আল্লাহ্‌র মতই সর্বত্র বিরাজমান' উপস্থিত ও দর্শক (হাযির ও নাযির) বলেও বিশ্বাস করে। তারা মনে করে যে, এভাবে তারা মহানবী (সা)-র মহত্ত্ব ও মহব্বত ফুটিয়ে তুলছে। অথচ এটা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ ও আজীবন সাধনার প্রকাশ্য বিরোধিতা। আলোচ্য আয়াতে এসব মুসলমানের জন্যও শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ্‌র কাছে মহানবী (সা)-র মহত্ত্ব ও মহব্বত এতটুকু কাম্য, যতটুকু সাহাবায়ে-কেরামের অন্তরে তাঁর প্রতি ছিল। এতে ত্রুটি করাও অপরাধ এবং একে বাড়িয়ে দেওয়াও বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা।

নবী ও রসূলের যে কোন রকম মনগড়া প্রকারভেদই পথভ্রষ্টতা ঃ এমনিভাবে কোন কোন সম্প্রদায় খতমে নবুয়ত অস্বীকার করে নতুন নবীর আগমনের পথ খুলে দিতে চেয়েছে। তারা কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' (সর্বশেষ নবী)-কে উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে নবী ও রসূলের অনেক মনগড়া প্রকার আবিষ্কার করে নিয়েছে। এসব প্রকারের নাম রেখেছে 'নবী যিল্লী' (ছায়া-নবী) 'নবী বুরুযী' (প্রকাশ্য নবী) ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতটি তাদের অবিমৃশ্যকারিতা ও পথভ্রষ্টতাকেও ফুটিয়ে তুলেছে। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা) রসূলগণের উপর যে ঈমান এনেছেন, তাতে 'যিল্লী বুরুযী' বলে কোন নামগন্ধও নেই। সুতরাং এটা পরিষ্কার ধর্মদ্রোহিতা।

আখেরাতের উপর ঈমান সম্পর্কে কোন অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় ঃ কিছুসংখ্যক লোকের মস্তিষ্ক ও চিন্তা-ভাবনা শুধু বস্তু ও বস্তুবাচক বিষয়াদির মধ্যেই নিমজ্জিত। অদৃশ্যজগৎ ও পরজগতের বিষয়াদি তাদের মতে অবান্তর ও অযৌক্তিক। তারা

এসব ব্যাপারে নিজ থেকে নানাবিধ ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয় এবং একে দ্বীনের খেদমত বলে মনে করে। তারা এসব জটিল বিষয়কে বোধগম্য করে দিয়েছে বলে মনে করে গর্বও করে। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ উক্তির পরিপন্থী হওয়ার কারণে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। আখেরাতের অবস্থা ও ঘটনাবলী কোরআন ও হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, বিনা দ্বিধায় ও বিনা ব্যাখ্যায় তা বিশ্বাস করাই প্রকৃতপক্ষে ঈমান। হাশরের পুনরুত্থানের পরিবর্তে আত্মিক পুনরুত্থান স্বীকার করা এবং আযাব, সওয়াব, আমল, ওজন ইত্যাদি বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা বর্ণনা করা সবই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেছেন ঃ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ বাক্যে বলা হয়েছে যে, — আপনি বিরুদ্ধাচরণকারীদের ব্যাপারে মোটেও চিন্তা করবেন না। আমি স্বয়ং তাদের বুঝে নেব। এ বিষয়টি وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (আল্লাহ্ আপনাকে শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করছেন) —আয়াতে আরও পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ নিজেই তাদের হাত থেকে আপনাকে হেফাযত করবেন।

দ্বীন ও ঈমানের এক সুগভীর নমুনা রয়েছে, যা মানুষের আকার-অবয়বে বিধৃত হওয়া প্রয়োজন ঃ صِبْغَةَ اللّٰهِ ... ... পূর্ববর্তী আয়াতে مِلَّةَ اِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا বলে ইসলামকেই ইবরাহীমের ধর্ম বলা হয়েছিল। এ আয়াতে ইসলামকে সরাসরি আল্লাহ্র ধর্ম আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র ধর্মই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম। তবে রূপক অর্থে কোন পয়গম্বরের দিকে সম্বন্ধ করে একে সে পয়গম্বরের ধর্ম বলা হয়। এখানে ধর্মকে صِبْغَةٌ (রঙ) বা নমুনা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। এতে প্রথমত খৃস্টানদের একটি কুসংস্কারের খণ্ডন করা হয়েছে। কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা সপ্তম দিনে তাকে রঙীন পানিতে গোসল করাত এবং খত্নার পরিবর্তে একেই সন্তানের পবিত্রতা এবং খৃস্টধর্মের গভীর রঙে রাঙানো বলে মনে করত। আয়াতে বলা হয়েছে যে, পানির এ রঙ ধোয়ার পরেই শেষ হয়ে যায়। খত্না না করার ফলে দেহে যে ময়লা ও অপবিত্রতা থাকে, এ গোসল দ্বারা তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। কাজেই ধর্ম ও ঈমানের রঙই প্রকৃত রঙ। এ রঙ বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতার নিশ্চয়তার দেয় এবং স্থায়ীও থাকে।

দ্বিতীয়ত ধর্ম ও ঈমানকে নমুনা বা রঙ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রঙ বা

নমুনা যেমন চোখে দেখা যায়, মু'মিনের ঈমানের লক্ষণও তেমনি আকার-অবয়বে, ওঠা-বসায়, চলাফেরায়, কাজে-কর্মে ও অভ্যাস-আচরণে ফুটে ওঠা প্রয়োজন।

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ وَلَنَا أَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا
هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا
تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

(১৩৯) আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ্ সম্পর্কে তর্ক করছ? অথচ তিনিই আমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম, তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ। (১৪০) অথবা তোমরা কি বলছ যে, নিশ্চয়ই ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (আ) ও তাঁদের সন্তানগণ ইহুদী অথবা খৃস্টান ছিলেন। আপনি বলে দিন, তোমরা বেশী জান, না আল্লাহ্ বেশী জানেন? (১৪১) তার চাইতে অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে? আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন। সে সম্প্রদায় অতীত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা করছ তা তোমাদের জন্য। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (ইহুদী ও খৃস্টানদের) বলে দিন, তোমরা কি (এখনও) আমাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কাজ সম্পর্কে বিতর্ক করছ? (যে, তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন

না। অথচ তিনি আমাদের এবং তোমাদের (সকলেরই) পালনকর্তা (ও মালিক। সুতরাং এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে কোন বিশেষ সম্পর্ক নেই; যদিও তোমরা نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ [আমরা আল্লাহ্র সন্তান] বলে বিশেষ সম্পর্ক দাবী করছ।) আমরা আমাদের কৃতকর্মের ফল পাব, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল পাবে। (এ পর্যন্ত যেসব বিষয় বলা হলো, তা তো তোমাদের কাছেও স্বীকৃত।) আর (আল্লাহ্র শোকর যে,) আমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই (সন্তুষ্টির) জন্য নিজ (ধর্ম)-কে (শিরক ইত্যাদি থেকে) নির্ভেজাল রেখেছি। (তোমাদের বর্তমান অবস্থা এর বিপরীত। তোমাদের ধর্ম একে তো রহিত, তার উপর শিরক মিশ্রিত। 'উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র,' 'ঈসা আল্লাহ্র পুত্র'---এসব উক্তি থেকে তা জানা যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাদের অগ্রগণ্যতা দান করেছেন। কাজেই আমাদের মুক্তি না পাওয়ার কোন কারণ নেই।) অথবা (এখনও নিজেদেরকে সত্যপন্থী বলে প্রমাণিত করার জন্য) তোমরা (একথাই) বলছ যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের সন্তানদের (মধ্যে যারা পয়গম্বর ছিলেন, তাঁরা) সবাই ইহুদী অথবা খৃস্টান ছিলেন। এতদ্বারা তাঁদেরকেও তোমাদের স্বধর্মী সাব্যস্ত করার মাধ্যমে নিজেদের সত্যপন্থী হওয়া প্রমাণ করছ। (এর উত্তরে বলা হল,) হে মুহাম্মদ! (এতটুকু তাদের) বলে দিন, (আচ্ছা বল দেখি ---) তোমরা বেশী জান, না আল্লাহ্ তা'আলা বেশী জানেন? (একথা বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা বেশী জানেন। তিনি এসব পয়গম্বর [আ]-এর ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার বিষয়টি পূর্বেই প্রমাণ করেছেন। কাফিররাও একথা জানে, কিন্তু গোপন করে। সুতরাং) তার চাইতে বড় অত্যাচারী আর কে, যে এমন সাক্ষ্যকে গোপন করে, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার কাছে এসে পৌঁছেছে? (হে আহলে-কিতাবগণ!) আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (সুতরাং উপরোক্ত পয়গম্বরগণ) যখন ইহুদী কিংবা খৃস্টান ছিলেন না, তখন ধর্মের ক্ষেত্রে তোমরা তাঁদের অনুরূপ কি করে হলে? (অতএব তোমাদের সত্যপন্থী হওয়া সাব্যস্ত হয় না। এরা ছিলেন কৃতীপুরুষদের) সে সম্প্রদায় (যাঁরা) অতীত হয়ে গেছেন। তাঁদের কর্ম তাঁদের উপকারে আসবে এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের উপকারে আসবে। তাঁদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না। (যখন আলোচনাও হবে না তখন তদ্দ্বারা তোমাদের কোন উপকারও হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইখলাসের তাৎপর্য ঃ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ বাক্যটিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। নিষ্ঠা বা ইখলাসের অর্থ হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা)-এর বর্ণনামতে ধর্মে নিষ্ঠাবান হওয়া। অর্থাৎ,

আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার না করা এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য সৎকর্ম করা, মানুষকে দেখানোর জন্য অথবা মানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্য নয়।

কোন কোন বুযুর্গ বলেছেন. ইখলাস বা নিষ্ঠা হলো এমন একটি আমল, যা ফেরেশতাও জানে না, শয়তানও না। এটা আল্লাহ্ তা'আলা ও বান্দার মধ্যকার একটি গোপন রহস্য।

سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ
الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي
مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

(১৪২) এখন নির্বোধরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? আপনি বলুন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কা'বাগৃহ নামাযের কেবলা নির্দিষ্ট হওয়ার ফলে ইহুদীদের কেবলা পরিত্যক্ত হয়। এটি তাদের মনঃপূত না হওয়ার কারণে) এখন (এই) নির্বোধরা অবশ্যই বলবে, (মুসলমানদেরকে) তাদের পূর্বেকার কেবলা থেকে যেদিকে তারা মুখ করত (অর্থাৎ, বায়তুল-মোকাদ্দাস) কিসে (অন্যদিকে) ফিরিয়ে দিল? আপনি (উত্তরে) বলুন, পূর্ব (হউক) পশ্চিম (হউক, সব দিকই) আল্লাহ্‌র (মালিকানাধীন। তিনি মালিক-সুলভ ক্ষমতার দ্বারা যেদিককে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করেন। এ ব্যাপারে কারণ জিজ্ঞেস করার অধিকার কারও নেই। শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাসই হল সরল পথ। কিন্তু কারও কারও এ পথ অবলম্বন করার তওফীক হয় না। তারা অনর্থক কারণ খুঁজে বেড়ায়। তবে) আল্লাহ্ তা'আলা (নিজ কৃপায়) যাকে ইচ্ছা সোজা পথ বলে দেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে বিরোধিতাকারীদের আপত্তি বর্ণনা করে তার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। আপত্তি ও জওয়াবের পূর্বে কেবলার স্বরূপ

ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জেনে নেওয়া বান্ছনীয়। এতে আপত্তি ও তার জওয়াবটি সহজে বোঝা যাবে।

কেবলার শাব্দিক অর্থ মুখ করার দিক। প্রত্যেক ইবাদতে মু'মিনের মুখ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র দিকেই থাকে। আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বন্ধন থেকে মুক্ত, তিনি কোন বিশেষ দিকে অবস্থান করেন না। ফলে কোন ইবাদত-কারী যদি যে দিকে ইচ্ছা সেদিকেই মুখ করত কিংবা একই ব্যক্তি এক সময় এক দিকে অন্য সময় অন্যদিকে মুখ করত, তবে তাও স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী হতো না।

কিন্তু অপর একটি রহস্যের কারণে সমস্ত ইবাদতকারীর মুখ একদিকেই হওয়া উচিত। রহস্যটি এই--ইবাদত বিভিন্ন প্রকার। কিছু ইবাদত ব্যক্তিগত, আর কিছু ইবাদত সমষ্টিগত। আল্লাহ্র যিকির, রোযা প্রভৃতি ব্যক্তিগত ইবাদত। এগুলো নির্জনে ও গোপনভাবে সম্পাদন করতে হয়। নামায ও হজ্ব সমষ্টিগত ইবাদত। এগুলো সংঘবদ্ধভাবে এবং প্রকাশ্যে সম্পাদন করতে হয়। সমষ্টিগত ইবাদতের বেলায় ইবাদতের সাথে সাথে মুসলমানদের সংঘবদ্ধ জীবনের রীতি-নীতিও শিক্ষা দেওয়া লক্ষ্য থাকে। এটা সবারই জানা যে, সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থার প্রধান মৌলনীতি হচ্ছে বহু ব্যক্তিভিত্তিক ঐক্য ও একাত্মতা। এ ঐক্য যত দৃঢ় ও মজবুত হবে, সংঘবদ্ধ জীবন-ব্যবস্থাও ততই শক্ত ও সুদৃঢ় হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও বিচ্ছিন্নতা সংঘবদ্ধ জীবন-ব্যবস্থার পক্ষে বিষতুল্য। এরপর ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু কি হবে, তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে বিভিন্ন যুগের মানুষ বিভিন্ন মত পোষণ করেছে। কোন কোন সম্প্রদায় বংশকে কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে, কেউ দেশ ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে এবং কেউ বর্ণ ও ভাষাকে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে সাব্যস্ত করেছে।

কিন্তু আল্লাহ্র ধর্ম এবং পয়গম্বরদের শরীয়ত এ সব ইখতিয়ার-বহির্ভূত বিষয়কে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু করার যোগ্য মনে করেনি। প্রকৃতপক্ষে এসব বিষয় সমগ্র মানব জাতিকে একই কেন্দ্রে সমবেত করতে সমর্থও নয়। বরং চিন্তা করলে দেখা যায়, এ জাতীয় ঐক্য প্রকৃতপক্ষে মানব জাতিকে বহুধা-বিভক্ত করে দেয় এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ ও মতানৈক্যই সৃষ্টি করে বেশী।

বিশ্বের সকল পয়গম্বরের ধর্ম ইসলাম ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের ঐক্যকেই ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে এবং কোটি কোটি প্রভুর ইবাদতে বিভক্ত বিশ্বকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি আহবান জানিয়েছে। বলা বাহুল্য, এ কেন্দ্রবিন্দুতেই পূর্ব ও পশ্চিম, ভূত ও ভবিষ্যতের মানবমণ্ডলী একত্র হতে পারে। অতঃপর এ ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের ঐক্যকে বাস্তবে রূপায়ণ এবং শক্তিদানের উদ্দেশ্যে তৎসঙ্গে কিছু বাহ্যিক ঐক্যও যোগ করা হয়েছে। কিন্তু এসব বাহ্যিক ঐক্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তা এই যে, ঐক্যের বিষয়বস্তু কার্যগত

ও ইচ্ছাধীন হতে হবে—যাতে সমগ্র মানব জাতি স্বেচ্ছায় তা অবলম্বন করে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হতে পারে। বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ প্রভৃতি ঐচ্ছিক বিষয় নয়। যে ব্যক্তি এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, সে অন্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারে না। যে ব্যক্তি পাকিস্তানে অথবা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে, সে বিলেতে অথবা আফ্রিকায় জন্মগ্রহণে সক্ষম নয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণকায়, সে যেমন স্বেচ্ছায় শ্বেতকায় হতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে একজন শ্বেতকায় ব্যক্তিও স্বেচ্ছায় কৃষ্ণকায় হতে পারে না।

এমন বিষয়কে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হলে মানবতা অপরিহার্যভাবে শতধা, এমনকি সহস্রভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এ কারণে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত এ সব বিষয়কে ইসলাম পরিপূর্ণ সম্মান দান করলেও, মানব ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হতে দেয়নি। কারণ, এতে মানবমণ্ডলী শতধা বিভক্ত হয়ে যাবে। তবে ইসলাম ইচ্ছাধীন বিষয়সমূহে চিন্তাগত ঐক্যের সাথে সাথে কার্যগত ও আকারগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে। এতেও এমন বিষয়কে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা স্বেচ্ছায় অবলম্বন করা প্রত্যেক পুরুষ-স্ত্রী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে-গ্রাম্য, ধনী-দরিদ্রের পক্ষে সমান সহজ হয়। কাজেই ইসলামী শরীয়ত সারা বিশ্বের মানুষকে পোশাক, বাসস্থান ও পানাহারের ব্যাপারে কোন এক নিয়মের অধীন করেনি। কারণ, প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে প্রয়োজনাদিও ভিন্ন ভিন্ন। এমতাবস্থায় সবাইকে একই ধরনের পোশাক ও ইউনিফর্মের অধীন করে দিলে নানা অসুবিধা দেখা দেবে। যদি ন্যূনতম ইউনিফর্মেরও অধীন করে দেওয়া হয়, তাতেও মানবিক সমতার প্রতি অবিচার করা হবে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত উৎকৃষ্ট পোশাক ও বস্ত্রের অবমাননা করা হবে। পক্ষান্তরে আরও বেশী দামের ইউনিফর্মের অধীন করে দেওয়া হলে দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এ কারণে ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদের জন্য কোন বিশেষ পোশাক বা ইউনিফর্ম নির্দিষ্ট করেনি ; বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব পন্থা ও পোশাক প্রচলিত ছিল, সবগুলো যাচাই করে অপব্যয়, অযথা, গর্ব ও বিজাতীয় অনুকরণভিত্তিক পন্থা ও পোশাক-পরিচ্ছদকে নিষিদ্ধ করেছে। অবশিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এমনি বিষয়াদিকে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা ইচ্ছাধীন, সহজলভ্য ও সস্তা। উদাহরণত জামা'তের নামাযে কাতারবন্দী হওয়া, ইমামের ওঠাবসার পূর্ণ অনুকরণ, হজ্বের সময় পোশাক ও অবস্থানের অভিন্নতা ইত্যাদি।

এমনিভাবে কেবলার ঐক্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা যদিও যাবতীয় দিকের বন্ধন থেকে মুক্ত, তাঁর জন্য সবদিকই সমান, তথাপি নামাযে সমষ্টিগত ঐক্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববাসীর মুখমণ্ডল একই দিকে নিবদ্ধ থাকা একটি উত্তম, সহজ ও স্বাভাবিক ঐক্যপদ্ধতি। এতে সমগ্র পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের

মানবমণ্ডলী সহজেই একত্র হতে পারে। এখন সমগ্র বিশ্বের মুখ করার দিক কোন্‌টি হবে এর মীমাংসা মানুষের হাতে ছেড়ে দিলে তাও বিরাট মতানৈক্য এবং কলহের কারণ হয়ে যাবে। এ কারণে এর মীমাংসা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়াই উচিত। হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেই ফেরেশতাদের দ্বারা কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। আদম ও আদম-সন্তানদের জন্য সর্বপ্রথম কেবলা কা'বাগৃহকেই সাব্যস্ত করা হয়।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ ○

—মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ নির্মিত হয়, তা মক্কায় অবস্থিত এবং এ গৃহ বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত ও বরকতের উৎস।

নূহ্ (আ) পর্যন্ত সবার কেবলাই ছিল এ কা'বাগৃহ। নূহের আমলে সংঘটিত মহাপ্লাবনের সময় সমগ্র দুনিয়া নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং কা'বাগৃহের দেয়াল বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। তারপর হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। কা'বাগৃহই ছিল তাঁর এবং তাঁর উম্মতের কেবলা। অতঃপর বনী-ইসরাঈলের পয়গম্বরগণের জন্য বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা সাব্যস্ত করা হয়। আবুল আলীয়া বলেনঃ পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বায়তুল মোকাদ্দাসে নামায পড়ার সময় এমনভাবে দাঁড়াতেন, যাতে বায়তুল-মোকাদ্দাসের 'ছখরা' ও কা'বাগৃহ—উভয়টিই সামনে থাকে।---(কুরতুবী)।

শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নামায ফরয করা হলে কোন কোন আলেমের মতে প্রথমদিকে কা'বাগৃহকেই তাঁর কেবলা সাব্যস্ত করা হয়। মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছার পর, কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী হিজরতের কিছুদিন পূর্বে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা স্থির করার নির্দেশ আসে। সহীহ্ বোখারীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা) ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই নামায পড়েন। মসজিদে-নববীর যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন, সেখানে অদ্যাবধি চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে।---(কুরতুবী)

আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন ক্ষেত্রে মহানবী (সা) ছিলেন আপাদমস্তক আনুগত্যের প্রতীক। সেমতে বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়া অব্যাহত রাখলেও তাঁর স্বভাবগত আগ্রহ ও মনের বাসনা ছিল এই যে, আদম ও ইবরাহীম (আ)-এর কেবলাকেই পুনরায় তাঁর কেবলা সাব্যস্ত করা হোক। প্রিয়জনের মনের বাসনা পূর্ণ করাই আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত রীতি।

কবির ভাষায় ঃ

"তুমি যেমন চাইবে আল্লাহ্ তেমনি চাইবেন,
পরহেযগারের ইচ্ছা আল্লাহ্ স্মরণ করেন।"

মহানবী (সা)-এর অন্তরেও দৃঢ় আস্থা ছিল যে, তাঁর বাসনা অপূর্ণ থাকবে না। তাই ওহীর অপেক্ষায় তিনি বারবার আকাশের দিকে তাকাতেন। এ প্রসঙ্গেই কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۝

"—আপনার বারবার আকাশের দিকে তাকানো আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। আমি আপনাকে আপনার পছন্দমত কেবলার দিকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব। সেমতে ভবিষ্যতে আপনি নামাযে মসজিদে-হারাম তথা কা'বাগৃহের দিকে মুখ করুন।"

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মনের বাসনা প্রকাশ করে তা পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নামাযে হুবহু কা'বার দিকে মুখ করাই জরুরী নয়—কা'বা যেদিকে অবস্থিত, সেদিকে মুখ করাই যথেষ্ট ঃ এখানে একটি ফিকহ্-বিষয়ক সূক্ষ্ম তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। আয়াতে কা'বা অথবা বায়তুল্লাহ্ বলার পরিবর্তে 'মসজিদে-হারাম' বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বসবাসকারীদের পক্ষে হুবহু কা'বাগৃহ বরাবর দাঁড়ানো জরুরী নয় ; বরং পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের মধ্য থেকে যে দিকটিতে কা'বা অবস্থিত সেদিকে মুখ করলেই যথেষ্ট হবে। তবে যে ব্যক্তি মসজিদে-হারামে উপস্থিত রয়েছে কিংবা নিকটস্থ কোন স্থান বা পাহাড় থেকে কা'বা দেখতে পাচ্ছে, তার পক্ষে এমনভাবে দাঁড়ানো জরুরী যাতে কা'বাগৃহ তার চেহারার বরাবরে অবস্থিত থাকে। যদি কা'বাগৃহের কোন অংশ তার চেহারা বরাবরে না পড়ে তবে তার নামায শুদ্ধ হবে না। কা'বাগৃহ যাদের চোখের সামনে নেই এ বিধান তাদের জন্য নয়। তারা কা'বাগৃহ কিংবা মসজিদে-হারামের দিকে মুখ করলেই যথেষ্ট।

মোটকথা, হিজরতের ষোল/সতের মাস পর কা'বাগৃহ পুনর্বার মহানবী (সা) ও মুসলমানদের কেবলা নির্ধারিত হয়। এতে ইহুদী এবং কতিপয় মুশরিক ও মুনাফিক প্রশ্ন তুলে বলতে থাকে যে, তাদের ধর্মে স্থিতিশীলতা নেই, রোজ রোজ কেবলা পরিবর্তন হতে থাকে।

কোরআনের আলোচ্য আয়াতে 'নির্বোধরা আপত্তি করে' শিরোনামে তাদের এ আপত্তিরই উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে আপত্তির যে জওয়াব দেওয়া হয়েছে তাতে তাদের বোকামির নিদর্শন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

অর্থাৎ—আপনি বলে দিন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্ তা'আলারই মালিকানাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা সোজা-সরল পথ প্রদর্শন করেন।

এতে কেবলামুখী হওয়ার তাৎপর্য বিধৃত হয়েছে যে, কা'বা এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করে আল্লাহ্ তা'আলাই এ দু'টিকে পর্যায়ক্রমে কেবলা বানিয়েছেন, এছাড়া কা'বা কিংবা বায়তুল-মোকাদ্দাসের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এ দু'টিকে বাদ দিয়ে কোন তৃতীয় বা চতুর্থ বস্তুকেও কেবলা সাব্যস্ত করতে পারতেন। বস্তুত যা কেবলা বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেদিকে মুখ করলে যে সওয়াব হয়, তার একমাত্র কারণ, আল্লাহ্র আনুগত্য। এ আনুগত্যই কা'বার পুনর্নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের মৌলিক বিষয়। এ বিষয়টি অন্য এক আয়াতে আরও সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ط وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ ـ

অর্থাৎ পশ্চিম দিক অথবা পূর্বদিকে মুখ করার মধ্যে স্বতন্ত্র কোন সওয়াব বা পুণ্য নেই, কিন্তু আল্লাহ্র উপর ঈমান ও আনুগত্যের মধ্যেই পুণ্য নিহিত রয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ اَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকেই আল্লাহ্র মনোযোগ আকৃষ্ট পাবে।

এসব আয়াতে কেবলা অথবা কেবলামুখী হওয়ার তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলে বলা হয়েছে যে, এসব স্থানের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নেই; বরং কেবলা হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা যে এগুলোকে মনোনীত করছেন, এটাই সে স্থানের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র কারণ। এ দু'দিকে মুখ করার মধ্যে সওয়াবের কারণও আল্লাহ্র আনুগত্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। মহানবী (সা)-এর বেলায় কেবলা পরিবর্তনের রহস্য সম্ভবত এই যে, কার্যক্ষেত্রে মানুষ জেনে নিক যে, কেবলা কোন পূজনীয় মূর্তি বিগ্রহ নয়; বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র নির্দেশ। এই নির্দেশ যখন বায়তুল-মোকাদ্দাস সম্পর্কে অবতীর্ণ হল তখন তারা এদিকেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পরবর্তী আয়াতে স্বয়ং কোরআন এ রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছে ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ

অর্থাৎ আপনি পূর্বে যে কেবলার দিকে ছিলেন তাকে কেবলা করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে পেছনে সরে যায়, তা প্রকাশ করা।

কেবলার তাৎপর্য বর্ণনার মধ্যে নির্বোধ আপত্তিকারীদেরও জওয়াব হয়ে গেছে। তারা কেবলার পরিবর্তনকে ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী মনে করত এবং এজন্য মুসলমানদের ভর্ৎসনা করত। পরিশেষে বলা হয়েছে يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশের জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুত থাকাই হল সরল পথ। আল্লাহ্‌র কৃপায় মুসলমানরা এ সরল পথ অর্জন করেছে।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তিনটি বিষয়ের কারণে আহলে কিতাবরা মুসলমানদের সাথে সর্বাধিক হিংসা করে। প্রথমত, ইবাদতের জন্য সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট করার নির্দেশ সব উম্মতকেই দেওয়া হয়েছিল। ইহুদীরা শনিবারকে এবং খৃস্টানরা রবিবারকে নির্দিষ্ট করে নেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কাছে সে দিনটি ছিল শুক্রবার, যা মুসলমানদের ভাগে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনের পর মুসলমানদের জন্য যে কেবলা নির্ধারিত হয়েছে, অন্য কোন উম্মতের ভাগ্যে তা জোটেনি। তৃতীয়ত ইমামের পেছনে 'আমীন' বলা। এ তিনটি বিষয় একমাত্র মুসলমানরাই প্রাপ্ত হয়েছে। আহ্‌লে কিতাবরা এগুলো থেকে বঞ্চিত। ---(মসনদে আহমদ)

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

(১৪৩) এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি—যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদের অনুসারীবৃন্দ !) এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে (এমন এক) সম্প্রদায় করেছি, (যারা সর্বদিক দিয়ে একান্ত) মধ্যপন্থী যেন, (জাগতিক সম্মান ও

স্বাতন্ত্র্য ছাড়াও আখেরাতে তোমাদের অশেষ সম্মান প্রকাশ পায় যে,) তোমরা (একটি বড় মোকদ্দমায়, যার এক পক্ষ হবেন পয়গম্বরগণ এবং অপর পক্ষ হবে তাঁদের বিরোধীদের) মানবমণ্ডলীর বিপক্ষে সাক্ষ্যদাতা (সাব্যস্ত) হও এবং (অধিকতর সম্মান এই যে,) তোমাদের (সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন। (এ সাক্ষ্য দ্বারা তোমাদের সাক্ষ্য যে নির্ভরযোগ্য তা প্রমাণিত হবে। তোমাদের সাক্ষ্যের ফলে মোকদ্দমার রায় পয়গম্বরগণের পক্ষে যাবে এবং বিরোধীদল অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করবে। এটা যে উচ্চস্তরের সম্মান, তা বলাই বাহুল্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ মধ্যপন্থা ঃ وسط শব্দের অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়। আবু সায়ীদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মহানবী (সা) عدل শব্দ দ্বারা وسط -এর ব্যাখ্যা করেছেন। এর অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট। (কুরতুবী) আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত করা হয়েছে। এর ফলে তারা হাশরের ময়দানে একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে। সকল পয়গম্বরের উম্মতরা তাঁদের হেদায়েত ও প্রচারকার্য অস্বীকার করে বলতে থাকবে, দুনিয়াতে আমাদের কাছে কোন আসমানী গ্রন্থ পৌঁছেনি এবং কোন পয়গম্বরও আমাদের হেদায়েত করেন নি। তখন মুসলিম সম্প্রদায় পয়গম্বরগণের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে উপস্থিত হবে এবং সাক্ষ্য দিবে যে, পয়গম্বরগণ সব যুগেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আনীত হেদায়েত তাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য তাঁরা সাধ্যমত চেষ্টাও করেছেন। বিবাদী উম্মতরা মুসলিম সম্প্রদায়ের সাক্ষ্যে প্রশ্ন তুলে বলবে, আমাদের আমলে এই সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমাদের ব্যাপারাদি তাদের জানার কথা নয়। কাজেই আমাদের বিপক্ষে তাদের সাক্ষ্য কেমন করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে ?

মুসলিম সম্প্রদায় এ প্রশ্নের উত্তরে বলবে, নিঃসন্দেহে তখন আমাদের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু আমাদের নিকট তাদের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কিত তথ্যাবলী একজন সত্যবাদী রসূল ও আল্লাহ্র গ্রন্থ কোরআন সরবরাহ করেছে। আমরাও সে গ্রন্থের ওপর ঈমান এনেছি এবং তাদের সরবরাহকৃত তথ্যাবলীকে চাক্ষুষ দেখার চাইতেও অধিক সত্য মনে করি, তাই আমাদের সাক্ষ্য সত্য। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিপত হবেন এবং সাক্ষীদের সমর্থন করে বলবেন, তারা যা কিছু বলছে, সবই সত্য। আল্লাহ্র গ্রন্থ এবং আমার শিক্ষার মাধ্যমে তারা এসব তথ্য জানতে পেরেছে।

হাশরের ময়দানে সংঘটিতব্য এ ঘটনার বিবরণ সহীহ বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী ও মসনদে আহ্মদের একাধিক হাদীসে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করা হয়েছে। তাই এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

মধ্যপন্থার রূপরেখা, তার গুরুত্ব ও কিছু বিবরণঃ (১) মধ্যপন্থার অর্থ ও তাৎপর্য কি? (২) মধ্যপন্থার এত গুরুত্বই বা কেন যে, এর ওপরই শ্রেষ্ঠত্বকে নির্ভরশীল করা হয়েছে? (৩) মুসলিম সম্প্রদায় যে মধ্যপন্থী, বাস্তবতার নিরিখে এর প্রমাণ কি? ধারাবাহিকভাবে এ তিনটি প্রশ্নের উত্তরঃ

(১) اعتدال (ভারসাম্য)-এর শাব্দিক অর্থ সমান হওয়া عدل মূল ধাতু থেকে এর উৎপত্তি, আর عدل এর অর্থও সমান হওয়া।

(২) যে গুরুত্বের কারণে ভারসাম্যকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বিষয়টি প্রথমে একটি স্থূল উদাহরণ দ্বারা বুঝুন। ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি যত নতুন ও পুরাতন চিকিৎসা-পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে, সে সবই এ বিষয়ে একমত যে, 'মেযাজে'র বা স্বভাবের ভারসাম্যের উপরই মানবদেহের সুস্থতা নির্ভরশীল। ভার-সাম্যের ত্রুটিই মানবদেহে রোগ বিকার সৃষ্টি করে। বিশেষত ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির মূলনীতিই মেযাজ পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। এ শাস্ত্র মতে মানবদেহ চারটি উপাদান--রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল ও পিত্ত দ্বারা গঠিত। এ চারটি উপাদান থেকে উৎপন্ন চারটি অবস্থা শৈত্য, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা মানবদেহে বিদ্যমান থাকা জরুরী। এ চারটি উপাদানের ভারসাম্যই মানবদেহে প্রকৃত সুস্থতা নিশ্চিত করে। পক্ষান্তরে যে কোন একটি উপাদান মেযাজের চাহিদা থেকে বেড়ে অথবা কমে গেলেই তা হবে রোগ-ব্যাধি। চিকিৎসা দ্বারা এর প্রতিকার না করলে এক পর্যায়ে পৌঁছে তাই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই স্থূল উদাহরণের পর এখন আধ্যাত্মিক সুস্থতা এবং ভারসাম্যহীনতার নাম আত্মিক ও চারিত্রিক অসুস্থতা। এ অসুস্থতার চিকিৎসা করে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা না হলে পারিণামে আত্মিক মৃত্যু ঘটে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রই জানে যে, যে উৎকৃষ্টতার কারণে মানুষ সমগ্র সৃষ্টি জীবের সেরা, তা তাঁর দেহ অথবা দেহের উপাদান অথবা সেগুলোর অবস্থা ; তাপ-শৈত্য নয়। কারণ, এসব উপাদান ও অবস্থার ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্য জীব-জন্তুও মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত ; বরং তাদের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষ এসব উপাদান মানুষের চাইতেও বেশী থাকে।

যে বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ 'আশরাফুল-মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা বলে গণ্য হয়েছে, তা নিশ্চিতই তার রক্ত-মাংস, চর্ম এবং তাপ ও শৈত্যের উর্ধ্বে কোন বস্তু যা মানুষের মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান রয়েছে—অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মধ্যে ততটুকু নেই। এ বস্তুটি নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করাও কোন সূক্ষ্ম ও কঠিন কাজ নয়। বলা বাহুল্য, তা হচ্ছে মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা। মাওলানা রুমী বলেনঃ

آدمیت لحم وشحم وپوست نیست
آدمیت جز رضائے دوست نیست

অর্থাৎ—মেদ-মাংস কিংবা ত্বক মানবতা নয়; মানবতা একমাত্র খোদাপ্রেম ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এ কারণেই যারা স্বীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মূল্য বুঝে না এবং তা নষ্ট করে দেয়, তাদের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

اینکہ می بینی خلاف آدم اند
نیستند آدم غلاف آدم اند

এসব যা দেখছ, তা মানবতা বিরোধী, এরা মানুষ নয়, শুধু মানুষের আবরণ মাত্র।

আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠাই যখন মানুষের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, মানবদেহের মত মানবাত্মাও যখন ভারসাম্য ও ভারসাম্যহীনতার শিকার হয় এবং মানবদেহের সুস্থতা যখন মেযাজ ও উপাদানের ভারসাম্য আর মানবাত্মার সুস্থতা যখন আত্মা ও চরিত্রের ভারসাম্য, তখন কামেল মানব একমাত্র তিনিই হতে পারেন, যিনি দৈহিক ভারসাম্যের সাথে সাথে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যেরও অধিকারী হবেন। এ উভয়বিধ ভারসাম্য সমস্ত পয়গম্বরকে বিশেষভাবে দান করা হয়েছিল এবং আমাদের রসূল (সা) তা সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ কারণে তিনিই সর্বপ্রধান কামেল মানব হওয়ার যোগ্য। শারীরিক চিকিৎসার জন্য যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সর্বকালে ও সর্বত্র চিকিৎসক, ডাক্তার, ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতির একটা অটুট ব্যবস্থা স্থাপন করে রেখেছেন, তেমনি আত্মিক চিকিৎসা এবং মানুষের মধ্যে চারিত্রিক ভারসাম্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে পয়গম্বরগণ প্রেরিত হয়েছেন। তাঁদের সাথে আসমানী গ্রন্থও পাঠানো হয়েছে এবং ভারসাম্য বিধানের লক্ষ্যে আইন প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্যও প্রদত্ত হয়েছে। কোরআনের সূরা হাদীদ-এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ -

অর্থাৎ—আমি প্রমাণাদিসহ রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের সাথে গ্রন্থ এবং মানদণ্ডও অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আমি লৌহ নাযিল করেছি—এতে প্রবল শক্তি রয়েছে এবং নিহিত রয়েছে মানুষের জন্য অনেক উপকারিতা।

আয়াতে পয়গম্বর প্রেরণ ও গ্রন্থ অবতরণের রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলোর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চারিত্রিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা হবে এবং লেনদেন

ও পারস্পরিক আদান-প্রদান বৈষয়িক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানদণ্ড নাযিল করা হয়েছে। মানদণ্ড অর্থ প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়ত হতে পারে। শরীয়ত দ্বারা সত্যিকার ভারসাম্য জানা যায় এবং ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, মানবমণ্ডলীকে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করাই পয়গম্বর ও আসমানী গ্রন্থ প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এটাই মানব মণ্ডলীর সুস্থতা।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বপ্রকার ভারসাম্য নিহিত ঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا

অর্থাৎ—আমি তোমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় করেছি। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আপনি অনুমান করতে পারেন যে, وسط শব্দটি উচ্চারণ ও লেখায় একটি সাধারণ শব্দ হলেও তাৎপর্যের দিক দিয়ে কোন সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তির মধ্যে যত পরাকাষ্ঠা থাকা সম্ভব, সে সবগুলোকে পরিব্যাপ্ত করেছে।

আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী, ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের উৎকৃষ্টতা তাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে এবং পয়গম্বর ও আসমানী গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছে, তাতে এ সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ।

কোরআন বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেছে। সূরা আ'রাফের শেষভাগে এ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُونَ অর্থাৎ, আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা সৎপথ প্রদর্শন করে এবং তদনুযায়ী ন্যায়বিচার করে।

এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য বিধৃত হয়েছে যে, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আসমানী গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেরাও চলে এবং অন্যদেরকেও চালাবার চেষ্টা করে। কোন ব্যাপারে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়ে গেলে, তার মীমাংসাও তারা গ্রন্থের সাহায্যেই করে, যাতে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার কোন আশংকা নেই।

সূরা আলে-ইমরানে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ভারসাম্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ -

তোমরাই সেই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান রাখবে।

অর্থাৎ, তারা যেমন সব পয়গম্বরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর প্রাপ্ত হয়েছে, সব গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত ও পূর্ণতর গ্রন্থ লাভ করেছে, তেমনি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাধিক সুস্থ মেযাজ এবং ভারসাম্যও সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তারা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্ত্ব-রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। ঈমান, আমল ও খোদাভীতির সমস্ত শাখা-প্রশাখা তাদের ত্যাগের দৌলতে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠবে। তারা কোন বিশেষ দেশ ও ভৌগোলিক সীমার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না। তাদের কর্মক্ষেত্র হবে সমগ্র বিশ্ব এবং জীবনের সকল শাখায় পরিব্যাপ্ত। তাদের অস্তিত্ব অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষা ও তাদের বেহেশতের দ্বারে উপনীত করার কাজে নিবেদিত হবে। أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ বাক্যাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়টি অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষা ও উপকারের নিমিত্তেই সৃষ্ট। তাদের অভীষ্ট কর্তব্য ও জাতীয় পরিচয় এই যে, তারা মানুষকে সৎকাজের দিকে পথ দেখাবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে।

الدين النصيحة রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ উক্তির অর্থও তাই। অর্থাৎ, সকল মুসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষা করাই হচ্ছে ধর্ম। কুফর, শিরক, বিদ্‌আত্, কুসংস্কার, পাপাচার, অসচ্চরিত্রতা, অন্যায় কথাবার্তা ইত্যাদি সবই মন্দ কাজ। এসব থেকে বিরত রাখার উপায়ও বিবিধ। কখনও বাহুবলে, কখনও কলমের জোরে এবং কখনও তরবারির সাহায্যে। মোটকথা, সবরকম জিহাদই এর অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম সম্প্রদায় যেমন ব্যাপকভাবে ও পরম নিষ্ঠার সাথে এসব কর্তব্য পালন করছে তার দৃষ্টান্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না।

(৩) বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় হওয়ার প্রমাণ কি? এখন এ তৃতীয় প্রশ্নটি আলোচনাসাপেক্ষ। এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে হলে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম চরিত্র ও কীর্তিসমূহ যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে নমুনাস্বরূপ কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

বিশ্বাসের ভারসাম্য ঃ সর্বপ্রথম বিশ্বাসগত ভারসাম্য নিয়েই আলোচনা করা যাক। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্‌র

পুত্র মনে করে তাদের উপাসনা ও আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন, এক আয়াতে রয়েছে ঃ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللّٰهِ (ইহুদীরা বলেছে, ওযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র এবং খৃস্টানরা বলেছে, মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র) অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অপরাপর ব্যক্তিরা পয়গম্বরের উপর্যুপরি মো'জেযা দেখা সত্ত্বেও তাদের পয়গাম্বর যখন তাদেরকে কোন ন্যায়যুদ্ধে আহবান করেছেন, তখন পরিষ্কার বলে দিয়েছে ঃ اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُونَ ০ (অর্থাৎ, আপনি এবং আপনার পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব।) আবার কোথাও পয়গম্বরগণকে স্বয়ং তাদের অনুসারীদের হাতেই নির্যাতিতও হতে দেখা গেছে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি এমন ইশ্‌ক ও মহব্বত পোষণ করে যে, এর সামনে জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, ইজ্জত-আবরু সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

سلام اسپر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں
بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں

অপরদিকে রসূলকে রসূল এবং আল্লাহ্‌কে আল্লাহ্‌ই মনে করে। এতসব পরাকাষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তারা আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল বলেই বিশ্বাস করে এবং মুখে প্রকাশ করে। তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে গিয়েও তারা একটা সীমার ভিতরে থাকে। 'কাছীদাহ্-বুরদা' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم — واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم

অর্থাৎ—খৃস্টানরা তাদের পয়গম্বর সম্পর্কে যা দাবী করে, সে কুফরী বাক্য পরিহার করে মহানবীর প্রশংসায় যা বলবে, তা-ই সত্য ও নির্ভুল!

এরই সারমর্ম পারস্য কবি হাফেয নিম্নের পংক্তিতে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر অর্থাৎ—সংক্ষেপে খোদার পরে আপনিই মহত্তর।

কর্ম ও ইবাদতের ভারসাম্য ঃ বিশ্বাসের পরই শুরু হয় আমল ও ইবাদতের পালা। এক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়—তারা শরীয়তের বিধি-বিধানকে কানাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, ঘুষ-উৎকোচ নিয়ে আসমানী গ্রন্থকে পরিবর্তন করে অথবা মিথ্যা ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে

ধর্মীয় বিধান পরিবর্তন করে এবং ইবাদত থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের উপাসনালয়সমূহে এমন লোকও দেখা যায়, সংসারধর্ম ত্যাগ করে যারা বৈরাগ্য অবলম্বন করেছে। তারা খোদাপ্রদত্ত হালাল নেয়ামত থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে এবং কষ্ট সহ্য করাকেই সওয়াব ও ইবাদত বলে মনে করে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি জুলুম বলে মনে করে এবং অপরদিকে আল্লাহ্ ও রসূলের বিধি-বিধানের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা রোম ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসনের অধিপতি ও মালিক হয়েও বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ধর্মনীতি ও রাজনীতির মধ্যে কোন বৈরিতা নেই এবং ধর্ম মসজিদ ও খানকায়ে আবদ্ধ থাকার জন্য আসেনি; বরং হাট-ঘাট, মাঠ-ময়দান, অফিস-আদালত এবং মন্ত্রণালয়সমূহে এর সাম্রাজ্য অপ্রতিহত। তাঁরা বাদশাহীর মাঝে ফকিরী এবং ফকিরীর মাঝে বাদশাহী শিক্ষা দিয়েছে।

چو فقر اندر لباس شاهی آمد ز تدبیر عبید اللهی آمد

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য ঃ এরপর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা মানবাধিকারের প্রতি পরওয়াও করেনি; ন্যায়-অন্যায়ের তো কোন কথাই নেই। নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেখলে তাকে নিষ্পেষিত করা, হত্যা ও লুণ্ঠন করাকেই বড় কৃতিত্ব মনে করা হয়েছে। জনৈক বিত্তশালীর চারণভূমিতে অপরের উট প্রবেশ করে কিছু ক্ষতি সাধন করায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায়। এতে কত মানুষ যে নিহত হয়, তার কোন ইয়ত্তা নেই। মহিলাদের মানবাধিকার দান করা তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকারও অনুমতি দেওয়া হত না। কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত সমাহিত করার প্রথা এবং কোথাও মৃত স্বামীর সাথে দাহ করার প্রথা। অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়ার্দ্রতারও প্রচলন ছিল যে, পোকা-মাকড় হত্যা করাকেও অবৈধ জ্ঞান করা হত। জীব-হত্যাকে তো দস্তুরমত মহাপাপ বলে সাব্যস্ত করা হত। আল্লাহ্র হালাল করা প্রাণীর গোশত ভক্ষণকে মনে করা হত অন্যায়।

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীয়ত এসব ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটিয়েছে। তারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরেছে। শুধু শান্তি ও সন্ধির সময়ই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের একটা সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লঙ্ঘন করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। নিজ অধিকারের ব্যাপারে ক্ষমা, মার্জনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং অপরের অধিকার প্রদানে যত্নবান হওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য ঃ এরপর অর্থনীতি বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রেও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে

রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুরবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ করে অধিকতর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তিমালিকানাকে অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, উভয় অর্থব্যবস্থার সারমর্মই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপাসনা, ধন-সম্পদকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান করা এবং এরই জন্য যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করা।

মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীয়ত এক্ষেত্রেও একান্ত ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব অর্থব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছে। ইসলামী শরীয়ত একদিকে ধন-সম্পদকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও কোন পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি ; অপরদিকে সম্পদ বন্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে---যাতে কোন মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াকফের আওতায় রেখেছে। বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

মোটকথা, এ আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ। এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারসাম্য ও ভারসাম্যহীনতার কয়েকটি নমুনা পেশ করাই ছিল উদ্দেশ্য। সুতরাং এতটুকুই যথেষ্ট। এতে আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু ফুটে উঠেছে যে, মুসলমান সম্প্রদায়কে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় করা হয়েছে।

সাক্ষ্যদানের জন্য ন্যায়ানুগ হওয়া শর্ত ঃ لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

মুসলিম সম্প্রদায়কে ভারসাম্যপূর্ণ তথা ন্যায়ানুগ করা হয়েছে---যাতে তারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়। এতে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি আদেল বা ন্যায়ানুগ নয়, সে সাক্ষ্যদানের যোগ্য নয়। আদেলের অর্থ সাধারণত 'নির্ভরযোগ্য' করা হয়। এর সম্পূর্ণ শর্ত ফিকাহ্ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত রয়েছে।

ইজ্‌মা শরীয়তের দলীল ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন, ইজ্‌মা (মুসলিম ঐকমত্য) যে শরীয়তের একটি দলীল, আলোচ্য আয়াত তার প্রমাণ। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্প্রদায়কে সাক্ষ্যদাতা সাব্যস্ত করে অপরাপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে তাদের বক্তব্যকে দলীল করে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের ইজ্‌মা বা ঐকমত্যও একটি দলীল এবং তা পালন করা ওয়াজিব। সাহাবীগণের ইজমা তাবেয়ীগণের জন্য এবং তাবেয়ীগণের ইজমা তাঁদের পরবর্তীদের জন্য দলীলস্বরূপ।

তফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে ঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের যেসব ক্রিয়াকর্ম সর্বসম্মত, তা আল্লাহ্‌র কাছে প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয়। কারণ, যদি মনে করা হয় যে, তারা ভ্রান্ত বিষয়ে একমত হয়েছে, তবে তাদের নির্ভর-যোগ্য সম্প্রদায় বলার কোন অর্থ থাকে না।

ইমাম জাস্‌সাস বলেন ঃ এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক যুগের মুসলমানদের ইজমাই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয়। 'ইজমা শরীয়তের দলীল'—একথাটি প্রথম শতাব্দী অথবা বিশেষ কোন যুগের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। কারণ আয়াতে সমগ্র সম্প্রদায়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। যারা আয়াত নাযিলের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁরাই শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নন; বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান আসবে, তারা সবই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং প্রতি যুগের মুসলমানই 'আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য-দাতা'। তাদের উক্তি দলীল। তারা কোন ভুল বিষয়ে একমত হতে পারে না।

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ
لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

(১৪৩) আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই এটা কঠোরতম বিষয়, কিন্তু তাদের জন্য নয়, যাদের আল্লাহ্ পথ-প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুণাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আমি মুহাম্মদী শরীয়তের জন্য প্রকৃতপক্ষে কা'বাকেই কেবলা মনোনীত করে রেখেছিলাম।) আপনি যে কেবলার উপর (কিছুদিন কায়েম) ছিলেন, (অর্থাৎ বায়তুল মোকাদ্দাস) তা শুধু এ কারণেই ছিল যে, আমি (বাহ্যতও) জেনে নেই যে, (এ কেবলা সাব্যস্ত হওয়ায় অথবা পরিবর্তন হওয়ায় ইহুদী ও অ-ইহুদীদের মধ্য থেকে) কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ করে এবং কে আতংকে পিঠটান দেয়। (এবং ঘৃণা ও বিরোধিতা করে। এ পরীক্ষার জন্য এই সাময়িক কেবলা নির্দিষ্ট করেছিলাম। পরে প্রকৃত কেবলার মাধ্যমে এ কেবলা রহিত করে দিয়েছি)। কেবলার এ পরিবর্তন (অবাধ্য লোকদের জন্য) কঠোরতর বিষয়। (তবে) যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পথ-প্রদর্শন করেছেন (আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়নি। তারা আগেও যেমন একে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মনে করত, এখনও তা-ই মনে করে। 'বায়তুল-মোকাদ্দাস প্রকৃত কেবলা ছিল না'—আমার এ উক্তি থেকে কেউ যেন

মনে না করে যে, যেসব নামায বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পড়া হয়েছে, তাতে সওয়াব কম হবে। কারণ, সেগুলো প্রকৃত কেবলার দিকে মুখ করে পড়া হয়নি। যাক এ কুমন্ত্রণাকে মনে স্থান দিও না। কারণ,) আল্লাহ্ তা'আলা এমন নন যে, তোমাদের ঈমান (সম্পর্কিত কাজকর্ম যেমন, নামাযের সওয়াব) নষ্ট (ও হ্রাস) করে দিবেন। বাস্তবিক, আল্লাহ্ তা'আলা (এমন যে,) মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল (ও) করুণাময়। (অতএব এমন স্নেহশীল ও করুণাময় সত্তা সম্পর্কে এরূপ কু-ধারণা সঙ্গত নয়। কারণ, কেবলা আসল হওয়া না প্রসঙ্গে আমিই জানি। তোমরা উভয়টিকে আমার নির্দেশ মনে করে কবুল করেছ, কাজেই সওয়াব হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কা'বা শরীফ সর্বপ্রথম কখন নামাযের কেবলা হয় ঃ হিজরতের পূর্বে মক্কা মোকাররমায় যখন নামায ফরয হয়, তখন কা'বাগৃহই নামাযের জন্য কেবলা ছিল, না বায়তুল-মোকাদ্দাস ছিল---এ প্রশ্নে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ শুরু থেকেই কেবলা ছিল বায়তুল-মোকাদ্দাস। হিজরতের পরও ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসই কেবলা ছিল। এরপর কা'বাকে কেবলা করার নির্দেশ আসে। তবে রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় অবস্থানকালে হাজরে-আসওয়াদ ও রোকনে-ইয়ামানীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যাতে কা'বা ও বায়তুল-মোকাদ্দাস—উভয়টিই সামনে থাকে। মদীনায় পৌঁছার পর এরূপ করা সম্ভবপর ছিল না। তাই তাঁর মনে কেবলা পরিবর্তনের বাসনা দানা বাঁধতে থাকে।—(ইবনে কাসীর)

অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেন ঃ মক্কায় নামায ফরয হওয়ার সময় কা'বাগৃহই ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক কেবলা। কেননা, হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর কেবলাও তাই ছিল। মহানবী (সা) মক্কায় অবস্থানকালে কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই নামায পড়তেন। মদীনায় হিজরতের পর তাঁর কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাস সাব্যস্ত হয়। তিনি মদীনায় ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। এরপর প্রথম কেবলা অর্থাৎ কা'বাগৃহের দিকে মুখ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। তফসীরে-কুরতুবীতে আবূ আমরের বরাত দিয়ে এ শেষোক্ত উক্তিকেই অধিকতর বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। এর রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, মদীনায় আগমনের পর যখন ইহুদীদের সাথে মেলামেশা শুরু হয়, তখন মহানবী (সা) তাদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র নির্দেশে তাদের কেবলাকেই কেবলা হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে যখন অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহুদীরা হঠকারিতা ত্যাগ করবে না, তখন হুযুর (সা)-কে সাবেক কেবলার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ, পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের কেবলা হওয়ার কারণে তিনি স্বভাবতই তাকে পছন্দ করতেন।

কুরতুবী আবুল-আলিয়া রিয়াহী থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সালেহ্ (আ)-

এর মসজিদের কেবলাও কা'বাগৃহের দিকে ছিল। এরপর আবুল-আলিয়া বলেন যে, জনৈক ইহুদীর সাথে একবার তিনি বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। ইহুদী বলল ঃ মূসা (আ)-র কেবলা ছিল বায়তুল-মোকাদ্দাসের সাখরা। আবুল আলিয়া বলেন ঃ না, মূসা (আ) বায়তুল-মোকাদ্দাসের সাখরার নিকটেই নামায পড়তেন, কিন্তু তাঁর মুখ-মণ্ডল কা'বাগৃহের দিকে থাকত। ইহুদী অস্বীকার করলে আবুল-আলিয়া বললেন ঃ আচ্ছা, তোমার আমার বিতর্কের মীমাংসা সালেহ্ (আ)-এর মসজিদই করে দেবে। মসজিদটি বায়তুল-মোকাদ্দাসের পাদদেশে একটি পাহাড়ে অবস্থিত। এরপর উভয়ে সেখানে গিয়ে দেখলেন, মসজিদটির কেবলা কা'বাগৃহের দিকেই রয়েছে।

যারা প্রথমোক্ত উক্তি গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মতে তাৎপর্য এই যে, মুসলমান-দের মক্কা মোকাররমায় মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ ও নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করা ছিল লক্ষ্য। এজন্য তাদের কেবলা ছেড়ে বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে হিজরতের পর মদীনায় ইহুদী ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধাচরণ ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণে তাদের কেবলার পরিবর্তে কা'বাকে কেবলা করা হয়েছিল। উপরোক্ত মতভেদের ফলে আলোচ্য আয়াতের তফসীরেও মতভেদ দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ, আয়াতে উল্লিখিত কেবলার অর্থ প্রথমোক্ত উক্তি অনুযায়ী বায়তুল-মোকাদ্দাস এবং শেষোক্ত উক্তি অনুযায়ী কা'বাগৃহ হতে পারে। কেননা, এটাই ছিল মহানবী (সা)-র কেবলা।

উভয় উক্তি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমি কেবলা পরিবর্তনের ঘটনাকে আপনার অনুসারী মুসলমানদের জন্য একটি পরীক্ষা সাব্যস্ত করেছি---যাতে প্রকাশ্যভাবেও জানা হয়ে যায় যে, কে আপনার খাঁটি অনুসারী এবং কে নিজ মতামতের অনুসরণ করে। বস্তুত কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ নাযিল হওয়ার পর কতিপয় দুর্বল বিশ্বাসী মুসলমান অথবা কপট বিশ্বাসী মুনাফিক ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দোষারোপ করে বলে যে, তিনি স্বজাতির ধর্মের দিকেই ফিরে গেছেন।

কতিপয় মাস'আলা

সুন্নাহ্কে কখনও কোরআনের দ্বারাও রহিত করা হয় ঃ জাস্সাস 'আহ্কামুল-কোরআন' গ্রন্থে বলেন ঃ কোরআন মজীদে কোথাও একথা উল্লেখ নেই যে, রসূলুল্লাহ (সা)-কে হিজরতের পূর্বে অথবা পরে বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; বরং একথার প্রমাণ শুধু হাদীস ও সুন্নাহ্ থেকে পাওয়া যায়। অতএব যে বিষয়টি সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল, কোরআনের আয়াত সেটি রহিত কা'বাকে কেবলা করে দিয়েছে।

এতে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, হাদীসও একদিক দিয়ে কোরআন এবং কিছু বিধি-বিধান এমনও আছে, যা কোরআনে উল্লিখিত নেই---শুধু হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। কোরআন এসব বিধি-বিধানের শরীয়তগত মর্যাদা স্বীকার করে। কেননা, আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে যে, যেসব নামায রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পড়া হয়েছে, তাও আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয়।

'খবরে-ওয়াহিদ' 'কারীনা' দ্বারা জোরদার হলে তদ্দ্বারা কোরআনী নির্দেশ রহিত মনে করা যায়ঃ বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ আসার পর মহানবী (সা) প্রথম কা'বাগৃহের দিকে মুখ করে আসরের নামায পড়েন (কোন কোন রেওয়ায়েতে আসরের পরিবর্তে যোহরের নামাযেরও উল্লেখ রয়েছে)। জনৈক সাহাবী নামাযের পর এখান থেকে বাইরে গিয়ে দেখতে পান যে, বনী সালমা গোত্রের মুসলমানরা নিজেদের মসজিদে পূর্বের ন্যায় বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই নামায পড়ছেন। তিনি সজোরে বললেন, এখন কেবলা কা'বার দিকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এসেছি। একথা শুনে তাঁরা নামাযের মধ্যেই বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে কা'বার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। নোয়ায়লা বিনতে মুসলিম বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে, তখন মহিলারা পিছনের কাতার থেকে সামনে এসে যায় এবং পুরুষরা সামনের কাতার থেকে পিছনে চলে যায়। যখন কা'বার দিকে মুখ ফেরানো হল, তখন পুরুষদের কাতার ছিল সামনে, আর মহিলাদের কাতার ছিল পিছনে।—(ইবনে কাসীর)

বনু-সালমার মুসলমানরা যোহর অথবা আসরের নামায থেকেই কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ কার্যকর করে নেন। কিন্তু কোবার মসজিদে এ সংবাদ পরদিন ফজরের নামাযে পৌঁছায় তারাও নামাযের মধ্যেই বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে কা'বার দিকে মুখ করে নেন।—(ইবনে কাসীর, জাস্‌সাস)

ইমাম জাস্‌সাস এসব হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেনঃ

هذا خبر صحيح مستفيض فى ايدى اهل العلم قد تلقوه بالقبول فصار خبر التواتر الموجب للعلم -

অর্থাৎ এ হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে খবরে ওয়াহেদ হলেও শক্তিশালী কারীনার কারণে তাওয়াতুরের তথা ধারাবাহিক রেওয়ায়েতের পর্যায়ে পৌঁছে—যা নিশ্চিত জ্ঞান দান করে।

কিন্তু হানাফী মযহাবের ফিকহ্‌বিদগণের নীতি এই যে, খবরে-ওয়াহিদ দ্বারা কোন অকাট্য কোরআনী নির্দেশ রহিত হতে পারে না। এমতাবস্থায় হানাফী আলেমগণের বিরুদ্ধে প্রশ্ন থেকে যায় যায় যে, তাঁরা এ হাদীস গ্রহণ করে কিভাবে কোরআনের নির্দেশ রহিত স্বীকার করলেন? হাদীসটি তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌঁছলেও পৌঁছেছে পরবর্তীকালেঃ সংবাদটি প্রথম বনু-সালমা গোত্রের লোকদের একজনেই দিয়েছিল। জাস্‌সাস বলেন, আসল ব্যাপার এই যে, বনু-সালমাসহ সাহাবীগণ আগেই জানতেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বাকে কেবলা করার বাসনা পোষণ করেন। তিনি এজন্য দোয়াও করতেন। এই বাসনা ও দোয়ার কারণে সাহাবীগণের দৃষ্টিতে বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশটি ভবিষ্যতে বলবৎ না থাকার আশংকা প্রকট হয়ে উঠেছিল। এ সম্ভাবনার কারণে বায়তুল-মোকাদ্দাসে কেবলা থাকার বিষয়টি

ধারণাভিত্তিক হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তা রহিত করার জন্য খবরে-ওয়াহিদই যথেষ্ট হয়েছে। অন্যথায় শুধু খবরে-ওয়াহিদ দ্বারা কোরআনী নির্দেশ রহিত হওয়া অযৌক্তিক।

লাউডস্পীকারের শব্দে নামাযে উঠা-বসা করলে নামায নষ্ট না হওয়ার প্রমাণ ঃ সহীহ্ বোখারীর 'কেবলা' অধ্যায় আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীসে কোরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর কেবলা পরিবর্তনের সংবাদ পৌঁছা ও নামাযের মধ্যেই মুসল্লীদের কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে আল্লামা আইনী হানাফী বলেন ঃ فيه جواز تعليم من ليس فى الصلوة من هو فيها অর্থাৎ, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি নামাযে শরীক নয়, সে নামাযে শরীক ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে পারে।—(উমদাতুল ক্বারী, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ)

আল্লামা আইনী এ হাদীস প্রসঙ্গে অন্যত্র লেখেন ঃ وفيه استماع المصلى لكلام من ليس فى الصلوة فلا يضر صلوته ـ অর্থাৎ, এ হাদীসেই প্রমাণ রয়েছে যে, মুসল্লী নামাযরত অবস্থায় নামাযের বাইরের লোকের কথা শুনতে পারে এবং তদনুযায়ী আমল করতে পারে। এতে তার নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। —(উমদাতুল-ক্বারী, ১ম খণ্ড, ২৪২ পৃঃ)

সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ফিকহ্বিদ আলেমগণ বলেন, নামাযরত অবস্থায় নামাযের বাইরের লোকের কথায় সাড়া দিলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এর উদ্দেশ্য এই যে, নামাযে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নির্দেশ অনুসরণ করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি কোন মানুষের মধ্যস্থতায় আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসরণ করে, তবে নামায ফাসেদ হবে না।

ফিকহ্বিদগণ আরও একটি মাস'আলা লিখেছেন। তা এই যে, যদি কেউ নামাযের জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য এমন সময় আসে, যখন প্রথম কাতার পূর্ণ হয়ে যায় এবং তাকে একাকী পিছনের কাতারে দাঁড়াতে হয়, তবে সে প্রথম কাতার থেকে একজনকে পিছনে টেনে নিজের সঙ্গে যুক্ত করে নেবে। এখানেও প্রশ্ন আসে যে, তার কথায় যে ব্যক্তি প্রথম কাতার থেকে পিছনে সরে আসবে, সে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের আদেশ অনুসরণ করল। সুতরাং তার নামায নষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু দুররে-মুখতার গ্রন্থের 'ইমামত' অধ্যায়ে এ মাস'আলা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

ثم نقل تصحيح عدم الفساد فى مسئلة من جذب من الصف فتاخر فهل ثم فرق فليحرر —এর উপর আল্লামা তাহ্তাভী লেখেন— لانه امتثل امر الله —অর্থাৎ এ অবস্থায় নামায নষ্ট না হওয়ার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে সে আগন্তুকের আদেশ পালন করেনি ; বরং আল্লাহ্র সে আদেশই পালন করেছে যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছেছে যে, এরূপ অবস্থা দেখা দিলে সামনের কাতার থেকে পেছনে সরে আসা উচিত।

'শরহে ওয়াহ্বানীয়া' গ্রন্থে শরণবলালী (র) এ মাস'আলা উল্লেখ করে নামায নষ্ট হওয়া সম্পর্কিত অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। এরপর নিজের ভাষায় এভাবে তা খণ্ডন করেছেন ঃ

اذا قيل لمصل تقدم تتقدم (الى) فسدت صلوته - لانه امتثل امر غير الله فى الصلوة - لان امتثاله انما هو لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يضر -

উল্লিখিত সব রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় নামাযের বাইরের কোন লোকের কথায় সাড়া দিলে তা দুই কারণে হতে পারে। প্রথমত, বাইরের ব্যক্তির সন্তুষ্টির জন্য সাড়া দেওয়া। এ অবস্থায় নামায নষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত. সে ব্যক্তি যদি কোন মাসআলা বলে এবং নামাযী তা অনুসরণ করে, তবে তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র আদেশেরই অনুসরণ। এজন্য তার নামায নষ্ট হবে না। আল্লামা তাহ্তাভীর মীমাংসাও তাই।

اقول لوقيل بالتفصيل بين كونه امتثل امر الشارع فلا تفسد وبين كونه امتثل امر الداخل مراعاة لخاطره من غير نظر الى امر الشارع تفسد لكان حسنا - (طحطاوى على الدرر ص ٢٤٧ ج ٢)

এভাবে লাউডস্পীকারের মাসআলাটির মীমাংসাও সহজ হয়ে যাচ্ছে। এখানে লাউডস্পীকারের অনুসরণ করার কোন সম্ভাবনাই নেই। বরং এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ নির্দেশেরই অনুসরণ করা হয় যে, ইমাম যখন রুকু করে, তখন তোমরাও রুকু কর, ইমাম যখন সিজদা করে, তখন তোমরাও সিজদা কর। লাউডস্পীকার দ্বারা শুধু এতটুকু জানা যায় যে, এখন ইমাম রুকু অথবা সিজদায় যাচ্ছেন। এ জানার পর মুসল্লী ইমামেরই অনুসরণ করে, লাউডস্পীকারের নয়। বস্তুত ইমামের অনুসরণ হল খোদায়ী নির্দেশ।

উপরোক্ত আলোচনা এ ভিত্তিতে করা হল যে, কারো কারো মতে লাউডস্পীকারের আওয়াজ হুবহু ইমামের আওয়াজ নয়; বরং ইমামের আওয়াজের উদ্ধৃতি ও বর্ণনা। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, লাউডস্পীকারের আওয়াজ হুবহু ইমামেরই আওয়াজ (লাউডস্পীকারের নিজস্ব কোন আওয়াজ নেই)। এমতাবস্থায় নামায জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ما كان الله ليضيع ايمانكم এখানে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেওয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে

করতে থাকে যে, এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না।

কোন কোন হাদীসে এবং মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে নামায। মর্মার্থ এই যে, সাবেক কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যে সব নামায পড়া হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো নষ্ট করবেন না; বরং তা শুদ্ধ ও মকবুল হয়েছে।

সহীহ্ বোখারীতে ইবনে-আ'যেব (রা) এবং তিরমিযীতে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কা'বাকে কেবলা করার পর অনেকেই প্রশ্ন করে যে, যে সব মুসলমান ইতিমধ্যেই ইন্তিকাল করেছেন, তাঁরা বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে নামায পড়ে গেছেন—কা'বার দিকে নামায পড়ার সুযোগ পান নি, তাঁদের কি হবে? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে নামাযকে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের সব নামাযই শুদ্ধ ও গ্রহণীয়। তাদের ব্যাপারে কেবলা পরিবর্তনের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۭ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُوْنَ ۝

(১৪৪) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সেই কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব, যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। যারা আহলে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ্ বেখবর নন সেই সমস্ত কর্ম সম্পর্কে, যা তারা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আপনি মনে মনে কা'বাকে কেবলা করার বাসনা পোষণ করেন এবং ওহীর আশায় বারবার আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখেন যে, বোধ হয় ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছে। অতএব) নিশ্চয় আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখছি---(আপনার মনস্তুষ্টি আমার লক্ষ্য) এ কারণে আমি (ওয়াদা করছি যে,) আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দিব, যাকে আপনি পছন্দ করেন। (নিন, আমি সাথে সাথেই নির্দেশও দিয়ে দিচ্ছি যে,) এখন থেকে নামাযের মধ্যে আপন চেহারা মসজিদে-হারামের দিকে করুন (এ নির্দেশ একমাত্র আপনার জন্যই নয়; বরং আপনি এবং আপনার সম্প্রদায়ও তাই করবেন)। যেখানেই যে থাক (মদীনায় অথবা অন্যত্র, এমনকি স্বয়ং বায়তুল-মোকাদ্দাসে থাকলেও) স্বীয় মুখমণ্ডল সে (মসজিদে হারামের) দিকেই কর। (এ কেবলা নির্ধারণ সম্পর্কে) আহ্‌লে কিতাবও (সাধারণ আসমানী গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে) অবশ্যই জানতো যে, (শেষ যমানার পয়গম্বরের কেবলা এরূপ হবে এবং) এ নির্দেশ সম্পূর্ণ ঠিক (এবং) তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকেই (আগত। কিন্তু হঠকারিতাবশত তারা তা স্বীকার করে না)। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বে-খবর নন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে কা'বার প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আকর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে। এ আকর্ষণের বিভিন্ন কারণ বর্ণিত হয়েছে। এসব কারণের মধ্যে কোন বিরোধ নেই---সবই সম্ভবপর। উদাহরণত মহানবী (সা) ওহী অবতরণ ও নবুয়ত-প্রাপ্তির পূর্বে স্বীয় স্বভাবগত ঝোঁকে দ্বীনে ইবরাহিমীর অনুসরণ করতেন। ওহী অবতরণের পর কোরআনও তাঁর শরীয়তকে দ্বীনে-ইবরাহিমীর অনুরূপ বলেই আখ্যা দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর কেবলাও কা'বাই ছিল।

আরও কারণ ছিল এই যে, আরব গোত্রগুলো মৌখিকভাবে হলেও দ্বীনে ইবরাহিমী স্বীকার করত এবং নিজেদেরকে তার অনুসারী বলে দাবী করত। ফলে কা'বা মুসলমানদের কেবলা হয়ে গেলে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারত। সাবেক কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাস দ্বারা আহ্‌লে কিতাবদের আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ষোল-সতের মাসের অভিজ্ঞতার পর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ, মদীনার ইহুদীরা এর কারণে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে দূরে সরে যাচ্ছিল।

মোটকথা, কা'বা মুসলমানদের কেবলা সাব্যস্ত হোক---এটাই ছিল মহানবী (সা)-র আন্তরিক বাসনা। তবে আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীল পয়গম্বরগণ কোন দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করার অনুমতি আছে বলে না জানা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দরবারে কোন দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করেন না। এতে বোঝা যায় যে, মহানবী (সা) এ দোয়া করার অনুমতি পূর্বাহ্নেই পেয়েছিলেন। এজন্য তিনি কেবলা পরিবর্তনের দোয়া করেছিলেন এবং তা কবুল হবে বলে আশাবাদীও ছিলেন। এ কারণেই তিনি বারবার আকাশের

দিকে চেয়ে দেখতেন যে, ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছে কি না! আলোচ্য আয়াতে এ দৃশ্যটি বর্ণনা করার পর প্রথমে দোয়া কবুল করার ওয়াদা করা হয় --- فَلَنُوَلِّيَنَّكَ অর্থাৎ আমি আপনার চেহারা মোবারক সে-দিকেই ফিরিয়ে 'দিব' যেদিকে আপনি পছন্দ করেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সেদিকে মুখ করার আদেশ নাযিল করা হয়, যথা فَوَلِّ وَجْهَكَ এর বর্ণনা পদ্ধতিটি বিশেষ আনন্দদায়ক। এতে প্রথমে ওয়াদার আনন্দ ও পরে ওয়াদা পূরণের আনন্দ একই সাথে উপভোগ করা যায়। (---কুরতুবী, জাসসাস, মাযহারী)

নামাযে কেবলামুখী হওয়ার মাস'আলা ঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে সব দিকই সমান। قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহ্রই মালিকানাধীন। কিন্তু উম্মতের স্বার্থে সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য একটি দিককে কেবলা হিসাবে নির্দিষ্ট করে সবার মাঝে ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তবে এ দিকটি বায়তুল-মোকাদ্দাসও হতে পারত। কিন্তু মহানবী (সা)-র আন্তরিক বাসনার কারণে কা'বাকে কেবলা সাব্যস্ত করে আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে فول وجهك الى الكعبة অর্থাৎ, 'কা'বার দিকে অথবা বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ কর' বলার পরিবর্তে شطر المسجد الحرام (অর্থাৎ মসজিদে হারামের দিকে) বলা হয়েছে। এতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

প্রথমত যদিও আসল কেবলা বায়তুল্লাহ্ তথা কা'বা কিন্তু কা'বার দিকে মুখ করা সেখান পর্যন্তই সম্ভব, যেখান থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয়। যারা সেখান থেকে দূরে এবং কা'বা তাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকে, তাঁদের উপরও হুবহু কা'বার দিকে মুখ করার কড়াকড়ি আরোপ করা হলে, তা পালন করা খুবই কঠিন হতো। বিশেষ যন্ত্রপাতি ও অঙ্কের মাধ্যমেও নির্ভুল দিক নির্ণয় করা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে অনিশ্চিত হয়ে পড়তো। অথচ শরীয়ত সহজ-সরল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে বায়তুল্লাহ্ অথবা কা'বা শব্দের পরিবর্তে মসজিদুল হারাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বায়তুল্লাহ্ অপেক্ষা মসজিদুল-হারাম অনেক বেশী স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এ বিস্তৃত স্থানের দিকে মুখ করা দূর-দূরান্তের মানুষের জন্যও সহজ।

সংক্ষিপ্ত শব্দ الى -এর পরিবর্তে شطر শব্দটি ব্যবহার করায় কেবলার দিকে মুখ করার ব্যাপারটি আরও সহজ হয়ে গেছে। شطر দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়--- বস্তুর অর্ধাংশ ও বস্তুর দিক। আলোচ্য আয়াতে এর অর্থ হচ্ছে বস্তুর দিক। এতে বোঝা যায় যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বা অঞ্চলে বিশেষভাবে মসজিদে হারামের দিকে মুখ

করাও জরুরী নয়; বরং মসজিদে হারাম যেদিকে অবস্থিত, সে দিকের প্রতি মুখ করাই যথেষ্ট। —(বাহ্‌রে মুহীত)

প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের জন্য মসজিদে হারামের দিক হল পশ্চিম; যেদিকে সূর্য অস্ত যায়, সেই দিক। অতএব, সূর্যাস্তের দিকে মুখ করলেই কেবলার দিকে মুখ করার ফরয পালিত হবে। তবে শীত-গ্রীষ্মের পরিবর্তনে সূর্যাস্তের দিকও পরিবর্তিত হতে থাকে। এ কারণে ফিক্‌হবিদগণ শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর অস্তস্থলের মাঝামাঝি দিককে অস্তস্থলের কেবলার দিক সাব্যস্ত করেছেন। অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী গ্রীষ্মের অস্তস্থল ও শীতের অস্তস্থলের মধ্যবর্তী ৪৮ ডিগ্রী পর্যন্ত কেবলার দিক ঠিকই থাকবে এবং নামায জায়েয হবে। অঙ্কশাস্ত্রের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শরহে-চিগ্‌মিনী'র চতুর্থ অধ্যায় ৬৬ পৃষ্ঠায় উভয় অস্তদিকের দূরত্ব ৪৮ ডিগ্রী বলা হয়েছে।

কেবলার দিক জানার জন্য শরীয়ত মতে মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ও অঙ্কশাস্ত্র প্রয়োগ করা অপরিহার্য নয়ঃ কিছুসংখ্যক লোক উপমহাদেশের অনেক মসজিদের কেবলার দিকে দু'চার ডিগ্রী পার্থক্য দেখে বলে দিয়েছে যে, এসব মসজিদে নামায জায়েয হয় না। এটা নিছক মূর্খতা এবং অহেতুকভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস বৈ কিছু নয়।

ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধর এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য সমভাবে কার্যকরী। এ কারণে শরীয়তের বিধি-বিধানকে প্রত্যেক পর্যায়েই সহজ রাখা হয়েছে—যাতে প্রত্যেক শহর-গ্রাম, পাহাড়-ময়দান ও উপত্যকায় বসবাসকারী মুসলমান এসব বিধানকে দেখে-শুনে বাস্তবায়িত করতে পারে এবং যাতে কোন পর্যায়েই গণিত, অংক অথবা দিকদর্শন যন্ত্রের প্রয়োজন না পড়ে। ৪৮ ডিগ্রী পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম দিক প্রাচ্যবাসীদের কেবলা। এতে পাঁচ-দশ ডিগ্রী পার্থক্য হয়ে গেলেও তাতে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এক হাদীস দ্বারা বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে যায়। বলা হয়েছেঃ ما بين المشرق و المغرب قبلة —অর্থাৎ, পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝি কেবলা। তিনি মদীনাবাসীদের উদ্দেশে একথা বলেছিলেন। কারণ, তাদের কেবলা পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এ হাদীস যেন شطر المسجد الحرام -এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছে যে, মসজিদে-হারামের দিকে মুখ করাই যথেষ্ট। তবে মসজিদ নির্মাণের সময় যতটুকু সম্ভব কা'বার দিকের সঠিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করা উত্তম। সাহাবী, তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী মনীষিগণের কেবলা নির্ণয়ের ব্যাপারে সরল ও সোজা পন্থা ছিল এই যে, তাঁরা সাহাবীগণের নির্মিত কোন মসজিদ থাকলে তা দেখে তার আশ-পাশের মসজিদসমূহের কেবলা ঠিক করতেন। এমনিভাবে সারা বিশ্বের মুসলমানদের কেবলা ঠিক করা হয়েছে। এ কারণে দূরবর্তী দেশসমূহে কেবলার দিক জানার বিশুদ্ধ পন্থা হল প্রাচীন মসজিদসমূহের অনুসরণ করা। কারণ, অধিকাংশ দেশে সাহাবী ও

তাবেয়ীগণ মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছেন এবং কেবলার দিক নির্ণয় করেছেন। অতঃপর এগুলো দেখে মুসলমানরা অন্যান্য জনপদে নিজ নিজ মসজিদ নির্মাণ করেছেন।

অতএব মুসলমানদের এসব মসজিদই কেবলার দিক জানার জন্য যথেষ্ট। এ কাজে অহেতুক দার্শনিক প্রশ্নাদি উত্থাপন করা প্রশংসনীয় নয়, বরং নিন্দনীয় ও উদ্বেগের কারণ। অনেক সময় এ দুশ্চিন্তায় পড়ে মানুষ সাহাবী, তাবেয়ীন ও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করে যে, তাঁদের নামায দুরস্ত হয়নি। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ও চরম ধৃষ্টতা বৈ কিছু নয়। হিজরী অষ্টম শতাব্দীর খ্যাতনামা আলেম ইবনে রাহাব হাম্বলী এ কারণেই কেবলার দিক সম্পর্কে মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও সূক্ষ্ম গাণিতিক তর্কে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করেছেন। তাঁর ভাষ্য—

واما علم التسيير فاذا تعلم منه ما يحتاج اليه للاستهداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور ومازاد عليه فلا حاجة اليه وهو يشغل عما هو اهم منه وربما ادى الى التدقيق فيه الى اساءة الظن بمحاريب المسلمين فى امصارهم كما وقع فى ذالك كثير من اهل هذا العلم قديما وحديثا - وذالك يقضى الى انتقاد الصحابة والتابعين فى صلواتهم فى كثير من الامصار وهو باطل وقد انكر الامام احمد الاستدلال بالجدى وقال انما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة -

—অধিকাংশ ফিক্‌হ্‌বিদের মতে সৌরবিদ্যা এতটুকু শিক্ষা করা জায়েয, যদ্দ্বারা কেবলা ও রাস্তার পরিচয় লাভ করা যায়। এর বেশী শিক্ষা করার প্রয়োজন নেই। কারণ, এর বেশী শিক্ষা অন্যান্য অধিকতর জরুরী বিষয়াদি থেকে উদাসীন করে দিতে পারে। সৌরবিদ্যার গভীর তথ্যানুসন্ধান অনেক সময় মুসলিম দেশসমূহের মসজিদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে। এ বিদ্যার্জনে নিয়োজিত ব্যক্তিরা প্রায়ই এ ধরনের সন্দেহের সম্মুখীন হয়। এতে এরূপ বিশ্বাসও অন্তরে দানা বাঁধতে থাকে যে, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের নামায দুরস্ত হয়নি। এটা একেবারেই ভ্রান্ত কথা। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তারকার সাহায্যে কেবলা নির্ণয় করতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, "হাদীস অনুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ দিকই (মদীনার) কেবলা।"

যেসব জনবসতিহীন এলাকায় প্রাচীন মসজিদ নেই, সেখানে এবং নতুন দেশে কেবলা নির্ণয়ের ব্যাপারে শরীয়তসম্মত যে পন্থা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে বর্ণিত রয়েছে তা এই যে, চন্দ্র, সূর্য ও ধ্রুবতারা প্রভৃতির দ্বারা অনুসন্ধান করে কেবলার দিক নির্ণয় করতে হবে। এতে সামান্য বিচ্যুতি থাকলেও তা উপেক্ষা করতে হবে। কারণ 'বাদায়ে' গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী দূরবর্তী দেশসমূহে অনুমান-ভিত্তিক দিকই কেবলার সমতুল্য। এর উপর ভিত্তি করেই বিধি-বিধান কার্যকর হবে। উদাহরণত শরীয়ত নিদ্রাকে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু নির্গত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত করেছে। ফলে এখন

ওযু ভঙ্গের বিধান নিদ্রার সাথেও সম্পৃক্ত হয়েছে—বায়ু নির্গত হোক বা না হোক। অথবা শরীয়ত সফরকে কষ্টের পর্যায়ভুক্ত করেছে। এখন সফর হলেই রোযা রাখার ব্যাপারে স্বাধীনতার নির্দেশ দেওয়া হবে—কষ্ট হোক বা না হোক। এমনিভাবে দূরবর্তী দেশসমূহে প্রসিদ্ধ নির্দেশাদির মাধ্যমে অনুমান করে কেবলার যেদিক নির্ণয় করা হবে, তা-ই শরীয়তে কা'বার সমতুল্য হবে। আল্লামা বাহরুল ওলুম 'রাসায়েলুল-আরকান' গ্রন্থে বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন।

والشرط وقوع المسامتة على حسب مايرى المصلى ونحن غير مامورين بالمسامتة على ما يحكم به الالات الرصدية ولهذا افتوا ان الانحراف المفسد ان يتجاوز المشارق والمغارب -

—কেবলামুখী হওয়ার ব্যাপারে শর্ত ও কর্তব্য বিষয় এতটুকুই যে, মুসল্লীর মত ও অনুমান অনুযায়ী কা'বার সামনা-সামনি হতে হবে। মানমন্দিরের যন্ত্রপাতির মাধ্যমে যে দিক নির্ণয় করা হয়, তা অর্জন করতে আমরা আদিষ্ট নই। এ কারণে ফিক্‌হ্‌বিদগণের ফতোয়া এই যে, বিচ্যুতির কারণে নামায নষ্ট হয়, তা হল পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বিচ্যুত হওয়া।

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

(১৪৫) যদি আপনি আহ্‌লে-কিতাবদের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কেবলা মেনে নেবে না এবং আপনিও তাদের কেবলা মানেন না। তারাও একে অন্যের কেবলা মানে না। যদি আপনি তাদের বাসনা অনুসরণ করেন সে জ্ঞানলাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে নিশ্চয় আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সবকিছু বোঝা সত্ত্বেও তাদের হঠকারিতা এই পর্যায়ের যে,) যদি আপনি (এসব) আহ্‌লে কিতাবের সামনে (সারা দুনিয়ার সমুদয়) নিদর্শন (একত্রিত করে) উপস্থাপন

করেন তবুও তারা (কখনও) আপনার কেবলাকে গ্রহণ করবে না (তাদের বন্ধুত্বের আশা করা এজন্যও উচিত নয় যে, আপনার এ কেবলাও আর রহিত হবে না, সুতরাং) আপনিও তাদের কেবলা কবুল করতে পারেন না। (কাজেই ঐক্য বিধানের আর কোন উপায় অবশিষ্ট রইল না। আহ্লে কিতাবরা যেমন আপনার সাথে হঠকারিতা করে, তেমনি তাদের পরস্পরের মধ্যেও কোন মিল নেই। কেননা,) তাদের কোন দলই অন্য-দলের কেবলা কবুল করে না। (উদাহরণত ইহুদীরা বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা করে রেখেছিল এবং খৃস্টানরা পূর্বদিককে কেবলা করে রেখেছিল।) আর (আপনি তাদের রহিত ও শরীয়তে নিষিদ্ধ কেবলাকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ, যদিও তা এক সময় খোদায়ী নির্দেশ ছিল, কিন্তু মনসুখ বা রহিত হয়ে যাবার দরুন তার উপর তাদের বর্তমান আমল একান্তই বিদ্বেষপ্রসূত। কাজেই আল্লাহ্ না করুন), আপনি যদি তাদের (এহেন খামখেয়ালীপূর্ণ) কামনা-বাসনাগুলোর অনুসরণ করেন, (তাও আপনার নিকট প্রকৃষ্ট) জ্ঞান (সংক্রান্ত ওহী) আগমনের পর, তা'হলে নিশ্চিতই আপনি জালিমে পরিগণিত হয়ে যাবেন। (বস্তুত তারা হলো হুকুম অমান্যকারী। আর আপনি যেহেতু নিরপেক্ষ, কাজেই আপনার পক্ষে তেমনটি হওয়া অসম্ভব। সুতরাং আপনার পক্ষে তাদের মতামত অবলম্বন করে নেওয়া কেবলার বিষয়বস্তু ও যার অন্তর্গত সম্পূর্ণ অসম্ভব)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ —আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, খানায়ে কা'বা কিয়ামত পর্যন্ত আপনার কেবলা থাকবে। এতে ইহুদী-নাসারাদের সে মতবাদের খণ্ডন করাই ছিল উদ্দেশ্য যে, মুসলমানদের কেবলার কোন স্থিতি নেই, ইতিপূর্বে তাদের কেবলা ছিল খানায়ে কা'বা, পরিবর্তিত হয়ে বায়তুল-মোকাদ্দাস হল, আবার তাও বদলে গিয়ে পুনরায় খানায়ে-কা'বা হলো। আবারও হয়তো বায়তুল- মোকাদ্দাসকেই কেবলা বানিয়ে নেবে। ---(বাহ্রে মুহীত)

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ এখানে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নিয়ে হুযুর (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টির দ্বারা উম্মতে-মুহাম্মদীকে অবহিত করাই উদ্দেশ্য যে, উল্লিখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ এতই কঠিন ব্যাপার যে, স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-ও যদি এমনটি করেন (অবশ্য তা অসম্ভব), তবে তিনিও সীমালংঘনকারী বলে সাব্যস্ত হবেন।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ

فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ الْحَقُّ مِن
رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

(১৪৬) আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করে। (১৪৭) বাস্তব সত্য সেটাই, যা তোমার পালনকর্তা বলেন। কাজেই তুমি সন্দিহান হয়ো না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতে আহ্‌লে -কিতাব সম্প্রদায় কর্তৃক মুসলমানদের কেবলাকে সত্য জানা এবং মুখে তা অস্বীকার করার কথা আলোচিত হয়েছে। এ আয়াতে তেমনিভাবে কেবলার প্রবর্তক অর্থাৎ মহানবী [সা]-কে মনে মনে সত্য জানা এবং মুখে মুখে অস্বীকার করার বিষয় আলোচিত হচ্ছে।

যাদেরকে আমি (তওরাত ও ইঞ্জিল প্রভৃতি) কিতাব দান করেছি, তারা তওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত সুসংবাদসমূহের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ্ ([সা]-কে রসূল হিসাবে) এমন সন্দেহাতীতভাবে চেনে, যেমন নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে (তাদের আকার-অবয়বের দ্বারা) চিনতে পারে। (নিজের সন্তান-সন্ততিকে দেখে যেমন কখনো সন্দেহ হয় না যে, সে কে, তেমনিভাবে রসূল (সা)-এর ব্যাপারেও তাদের কোন সন্দেহ সংশয় নেই। বরং অনেকে তো ঈমান গ্রহণও করে নিয়েছে।) আবার তাদের মধ্যে অনেকে (রয়েছে, যারা) বিষয়টি বিস্তারিত জানা সত্ত্বেও গোপন করে। (অথচ) এটা যে বাস্তবিক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং (প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, এমন একটি বাস্তব ব্যাপারে) কখনও কোন প্রকার সন্দেহে পতিত হয়ো না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে রসূলে করীম (সা)-কে রসূল হিসাবে চেনার উদাহরণ সন্তানদের চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এরা যেমন কোন রকম সন্দেহ-সংশয়হীনভাবে নিজেদের সন্তানদেরকে জানে, তেমনিভাবে তওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত রসূলে করীম (সা)-এর সুসংবাদ, প্রকৃষ্ট লক্ষণ ও নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাঁকেও সন্দেহাতীতভাবেই চেনে। কিন্তু তাদের যে অস্বীকৃতি, তা একান্তভাবেই হঠকারিতা ও বিদ্বেষপ্রসূত।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পরিপূর্ণভাবে চেনার উদাহরণ পিতামাতাকে চেনার সাথে না দিয়ে সন্তান-সন্ততিকে চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে। অথচ মানুষ স্বভাবত

পিতামাতাকেও অত্যন্ত ভাল করেই জানে। এহেন উদাহরণ দেওয়ার কারণ হল এই যে, পিতামাতার নিকট সন্তানাদির পরিচয় সন্তানের নিকট পিতামাতার পরিচয় অপেক্ষা বহুগুণ বেশী হয়ে থাকে। কারণ, পিতা জন্মলগ্ন থেকে সন্তান-সন্ততিকে স্বহস্তে লালন-পালন করে। তাদের শরীরের এমন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, যা পিতামাতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে পিতামাতার গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্তানরা কখনও দেখে না।

এ বর্ণনার দ্বারা এ কথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, এখানে সন্তানকে শুধু সন্তান হিসাবে চেনাই উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তার পৈতৃক সম্পর্ক ক্ষেত্র বিশেষে সন্দেহ-জনকও হতে পারে। স্ত্রীর খেয়ানতের দরুন সন্তান তার নিজের নাও হতে পারে। বরং এখানে আকার-অবয়বের পরিচয় জানা হলো উদ্দেশ্য। পুত্র-কন্যা প্রকৃতপক্ষে নিজের হোক বা নাই হোক, কিন্তু মানুষ সন্তান হিসাবে যাকে প্রতিপালন করে, তার আকার-অবয়ব চেনার ব্যাপারে কখনও সন্দেহ হয় না।

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا
تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ
وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ
لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۗ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِىْ ۗ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٠﴾

(১৪৮) আর সবার জন্যই রয়েছে কেবলা একেক দিকে, যে দিকে সে মুখ করে (ইবাদত করবে)। কাজেই সৎ কাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকবে, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (১৪৯) আর যে স্থান থেকে তুমি বের হও, নিজের মুখ মস্‌জিদে

হারামের দিকে ফেরাও—নিঃসন্দেহে এটাই হলো তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত বাস্তব সত্য। বস্তুত তোমার পালনকর্তা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবহিত নন। (১৫০) আর তোমরা যেখান থেকেই বেরিয়ে আস এবং যেখানেই অবস্থান কর, সে দিকেই মুখ ফেরাও, যাতে করে মানুষের জন্য তোমাদের সাথে ঝগড়া করার অবকাশ না থাকে। অবশ্য যারা অবিবেচক তাদের কথা আলাদা। কাজেই তাদের আপত্তিতে ভীত হয়ো না; আমাকেই ভয় কর! যাতে আমি তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহসমূহ পূর্ণ করে দেই এবং তাতে যেন তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (কেবলা পরিবর্তনের দ্বিতীয় তাৎপর্য হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার রীতি অনুসারে) প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের জন্যই একেকটি কেবলা নির্ধারিত রয়েছে, (ইবাদত করার সময়) তারা সেদিকেই মুখ করে থাকে। (শরীয়তে মুহাম্মদীও যেহেতু একটি স্বতন্ত্র দ্বীন, কাজেই এর জন্যও একটি কেবলা নির্ধারণ করে দেওয়া হল। এ তাৎপর্যটি যখন সবাই জানতে পারল) কাজেই (হে মুসলমানগণ, এখন এসব বিতর্ক পরিহার করে) তোমরা সৎকাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাবার চেষ্টা কর। (কারণ, একদিন তোমাদেরকে নিজেদের মালিকের সম্মুখীন হতে হবে কাজেই) তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে (নিজের সামনে) অবশ্যই হাযির করবেন। (তখন সৎকাজের প্রতিদান এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।) বস্তুত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিশ্চয়ই যাবতীয় বিষয়ে ক্ষমতাশীল। আর (এ তাৎপর্যের তাকীদও এই যে, যেভাবে মুকীম অবস্থায় কা'বার দিকে মুখ করা হয়, তেমনিভাবে মদীনা কিংবা অন্য) যে কোনখান থেকে যদি আপনি সফরে গমন করেন, (তখনও নামায পড়ার সময়) নিজের চেহারা মসজিদে হারামের দিকে রাখবেন। (সারকথা, —মুকীম অবস্থায় হোক কিংবা সফরকালে হোক, সর্বাবস্থায় এটাই হল কেবলা।) আর (কেবলার ব্যাপারে) এই সাধারণ নির্দেশই হলো সম্পূর্ণ ও সঠিক এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে এতটুকুও অনবহিত নন।

কেবলা পরিবর্তনের তৃতীয় তাৎপর্য ঃ আর (আবারও বলা হচ্ছে যে, আপনি যেখানে সফরে বেরুবেন, (নামায পড়তে গিয়ে) মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করবেন (আর এ হুকুম মুকীম অবস্থায় অবশ্যই পালনীয়)। এছাড়া তোমরা (যারা মুসলমান, সবাই শুনে নাও) যেখানেই থাক না কেন, (নামায পড়তে গিয়ে) নিজেদের চেহারা এই মসজিদুল হারামের দিকেই রাখবে। (এই হুকুমটি এজন্যই নির্দিষ্ট করা হচ্ছে,) যাতে (বিরোধী) লোকদের পক্ষে তোমাদের বিরুদ্ধে এমন (কোন) কথা বলার সাহস না থাকে (যে, মুহাম্মদ [সা]-ই যদি শেষ যমানার সেই প্রতিশ্রুত নবী হতেন, তবে তাঁর লক্ষণগুলোর মধ্যে তো একথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, তাঁর

আসল কেবলা হবে কা'বাগৃহ, অথচ তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। এই হল কেবলা পরিবর্তনের তৃতীয় তাৎপর্য। তবে হাঁ,) এদের মধ্যে যারা (একান্তই) অবিবেচক, অর্বাচীন (তারা এখনও এমন কূট-যুক্তির অবতারণা করবে যে, তিনি যদি নবীই হবেন, তাহলে সমস্ত নবীর বিরুদ্ধে---মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করে নামায পড়েন কেমন করে। কিন্তু এহেন অবান্তর আপত্তিতে যেহেতু দ্বীনের কিছুই আসে যায় না, সেহেতু) তাদের কথা আলাদা। সুতরাং তাদের ব্যাপারে এতটুকুও আশংকা করো না---(এবং তাদের জওয়াব দেওয়ার পেছনেও পড়ো না)। একমাত্র আমাকেই ভয় করতে থাক (যাতে আমার বিধি-বিধানের কোন রকম বিরোধিতা না হয়। কারণ, এ ধরনের বিরোধিতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর)। আর (আমি উল্লিখিত বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার তওফীকও দিয়েছি) যাতে তোমাদের উপর আমার যে অনুগ্রহ ও করুণারাজি এসেছে, (তোমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে) তা পরিপূর্ণ করে দিতে পারি। এবং যাতে তোমরা (পৃথিবীতে ইসলামের) সরল ও সত্যপথের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পার (যার উপর নেয়ামতের পরিপূর্ণতা নির্ভরশীল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে--- فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ বাক্যটি তিনবার এবং حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ বাক্যটি দু'বার করে আবৃত্তি করা হয়েছে। এর একটা সাধারণ কারণ এই যে, কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশটি বিরোধীদের জন্য তো এক হৈ-চৈয়ের ব্যাপার ছিলই, স্বয়ং মুসলমানদের জন্যও তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে ছিল একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। কাজেই এই নির্দেশটি যদি যথার্থ তাকীদ ও গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করা না হতো, তাহলে মনের প্রশান্তি অর্জন হয়ত যথেষ্ট সহজ হতো না। আর সেজন্যই নির্দেশটিকে বারবার আবৃত্তি করা হয়েছে। তদুপরি এতে এরূপ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, কেবলার এই যে পরিবর্তন এটাই সর্বশেষ পরিবর্তন। এরপর পুনঃপরিবর্তনের আর কোন সম্ভাবনাই নেই।

বয়ানুল-কোরআনের তফসীরে, সংক্ষেপে নির্দেশটি বারবার উল্লেখের যে কারণ বর্ণিত হয়েছে, কুরতুবীতেও প্রায় একই যুক্তির কথা বলে পুনরুল্লেখের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা হয়েছে। যথা---প্রথমবারের নির্দেশ ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ○

---"অতঃপর তুমি তোমার মুখমণ্ডল মসজিদুল-হারামের দিকে ফেরাও এবং যেখানেই তুমি থাক না কেন, এরপর থেকে তুমি তোমার চেহারা সেদিকেই ফেরাবে" ---এ নির্দেশটি মুকীম অবস্থায় থাকার সময়ের। অর্থাৎ যখন আপনি আপনার স্থায়ী বাসস্থানে অবস্থান করেন, তখন নামাযে মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন। এরপর সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে حَيْثُمَا كُنْتُمْ নিজের দেশে বা শহরে যেখানেই থাক না কেন, নামাযে বায়তুল্লাহ্‌র দিকেই মুখ ফেরাবে, এ নির্দেশ শুধু মসজিদে নববীতে নামায পড়ার বেলাতেই নয় বরং যে কোন স্থানের লোকেরা নিজ নিজ শহরে যখন নামায পড়বে, তখন তারা মসজিদুল হারামকেই কেবলা বানিয়ে নামায পড়বে।

এ নির্দেশ দ্বিতীয়বার পুনরুল্লেখ করার পূর্বে وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ অর্থাৎ "যেখানেই তুমি বের হয়ে যাও না কেন" কথাটা যোগ করে বোঝানো হয়েছে যে, নিজ নিজ বাসস্থানে মুকীম থাকা অবস্থায় যেমন তোমরা মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করে নামায পড়বে, তেমনি কোথাও সফরে বের হলেও নামাযের সময় মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করেই দাঁড়াবে।

সফরের মধ্যেও কখনো কখনো বিভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সফর ছোট হয়, লম্বাও হয়। অনেক সময় কিছুটা চলার পর যাত্রা বিরতি করতে হয়, আবার সেখান থেকে নতুন করে সফর শুরু হয়। এরূপ অবস্থাতেও কেবলার ব্যাপারে কোন পরিবর্তন হবে না। সফর যে ধরনের এবং যে দিকেই হোক না কেন, নামাযে দাঁড়াবার সময় তোমাদেরকে ঘুরে-ফিরে মসজিদুল-হারামের দিকেই মুখ ফেরাতে হবে।

তৃতীয়বারের পুনরুল্লেখের যৌক্তিকতা বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, বিরোধীরা যাতে কথা বলতে না পারে যে, তওরাত এবং ইঞ্জিলে তো বলা হয়েছিল যে, তওরাত এবং ইঞ্জিলে উল্লিখিত নির্দেশসমূহের মধ্যে আখেরী-যমানার প্রতিশ্রুত নবীর কেবলা মসজিদুল হারাম হওয়ার কথা, কিন্তু এ রসূল (সা) কা'বার পরিবর্তে বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা করে নামায পড়ছেন কেন?

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا শব্দটিতে وِجْهَةٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু যার দিকে মুখ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ কেবলা। এক্ষেত্রে হযরত উবাই ইবনে কা'ব --- وِجْهَةٌ -এর স্থলে قِبْلَةٌ ও পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে।

তফসীরের ইমামগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই—

প্রত্যেক জাতিরই ইবাদতের সময় মুখ করার জন্য একটা নির্ধারিত কেবলা চলে আসছে। সে কেবলা আল্লাহ্‌র তরফ হতে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে অথবা তারা নিজেরাই তা নির্ধারণ করে নিয়েছে। মোটকথা, ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই কোন না কোন দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় আখেরী নবীর উম্মতগণের জন্য যদি কোন একটা বিশেষ দিককে কেবলা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কি আছে?

দ্বীনী ব্যাপারে অর্থহীন বিতর্ক পরিহার করার নির্দেশ

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ —এ আয়াতের পূর্বে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কেবলা চলে আসছে। সুতরাং একের পক্ষে অন্যের কেবলা মান্য না করাই স্বাভাবিক। সে হিসেবে নিজেদের কেবলার যথার্থতা নিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া অর্থহীন। উপরোক্ত বাক্যটির মূল বক্তব্য বিষয়-হচ্ছে যে, যখন বোঝা যাচ্ছে যে, এ বিতর্কে তাদের কোন উপকার হবে না, তারা তাদের ঐতিহ্যগত কেবলার ব্যাপারে অন্যের যুক্তি মানবে না, তখন এ অর্থহীন বিতর্কে কাল ক্ষেপণ না করে তোমাদের আসল কাজে আত্মনিয়োগ করাই কর্তব্য। সে কাজ হচ্ছে সৎকাজে সকল সাধনা নিয়োজিত করে একে অপর থেকে আগে চলে যাওয়ার চেষ্টা করা। যেহেতু অর্থহীন বিতর্কে সময় নষ্ট করা এবং সৎকর্মে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে আলসেমি প্রদর্শন করা সাধারণত আখেরাতের চিন্তায় গাফলতির কারণে হয়, সে জন্য আখেরাত সম্পর্কে যাদের চিন্তা রয়েছে, তারা কখনও অর্থহীন বিতর্কে জড়িত হয়ে সময় নষ্ট করে না। তারা সব সময় নিজ নিজ কর্তব্য করে যাওয়ার চিন্তায় বিভোর থাকে। এ জন্যই পরবর্তী আয়াতে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ○

যার মর্মার্থ হচ্ছে, বিতর্কে জয়-পরাজয় এবং সাধারণ লোকের নানা প্রশ্ন থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ব্যাপার। খুব শীঘ্রই এমন দিন আসছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র দুনিয়ার সকল জাতির মানুষকেই একত্র করে স্ব-স্ব আমলের হিসাব গ্রহণ করবেন। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে যতটুকু সময় পাওয়া যায়, তা সে কঠিন দিনের চিন্তায় ব্যয় করা।

নেক কাজ সমাধা করতে গিয়ে অনর্থক বিলম্ব করা সমীচীন নয় ঃ

فَاسْتَبِقُوْا —শব্দ দ্বারা এও বোঝা যায় যে, কোন সৎকাজের সুযোগ পাওয়ার পর তা সমাধা করার ব্যাপারে বিলম্ব করা উচিত নয়। কেননা অনেক সময় ইচ্ছাকৃত বিলম্বের ফলে সে কাজ সমাধা করার তওফীক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, সদকা, খয়রাত প্রভৃতি সর্ববিধ সৎ কাজে একই অবস্থা হতে পারে।

বিষয়টি সূরা আনফালের এক আয়াতে আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۝

অর্থাৎ—"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হও, যখন তাঁরা তোমাদেরকে নবজীবন-দায়িনী বিষয়ের প্রতি আহবান জানান। মনে রেখো, অনেক সময় আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ এবং তার অন্তরের মধ্যে আড়ালও সৃষ্টি করে থাকেন।"

প্রত্যেক নামাযই কি সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলা উত্তম ঃ সৎ কাজ দ্রুত সম্পাদন করার উপরোক্ত নির্দেশের ভিত্তিতে কোন কোন ফিক্হ্বিদ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, প্রত্যেক নামায সময় হওয়ার সাথে সাথে পড়ে নেওয়া উত্তম। আয়াতের সমর্থনে তাঁরা প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার ফযীলত সম্বলিত হাদীসও উদ্ধৃত করেন। ইমাম শাফেয়ী (র)-র অভিমত তাই। ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মালেক (র) এ ব্যাপারে অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে কিছুটা ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেসব নামায কিছুটা দেরী করে পড়েছেন বা পড়তে বলেছেন, সেগুলো তাঁর অনুসরণে একটু দেরী করে পড়াই উত্তম। অবশিষ্টগুলো প্রথম ওয়াক্তে পড়া ভাল। যেমন সহীহ্ বোখারীতে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে এশার নামায একটু দেরী করে পড়ার ফযীলত উল্লিখিত হয়েছে। হযরত আবূ হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এশার নামায কিছুটা দেরী করে পড়া পছন্দ করতেন।---(কুরতুবী)

অনুরূপ বোখারী ও তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ যর (রা) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে যে, এক সফরে হযরত বিলাল (রা) প্রথম ওয়াক্তেই যোহরের আযান দিতে চাইলে হুযুর (সা) তাঁকে এই বলে বারণ করলেন যে, 'দুপুরের গরম জাহান্নামের উত্তাপের একটা নমুনা। সুতরাং একটু ঠাণ্ডা হওয়ার পর আযান দাও।' এতে বোঝা যায় যে, গরমের দিনে যোহরের নামায তিনি একটু দেরী করে পড়া পছন্দ করতেন। উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মালেক (র)-এর অভিমত হচ্ছে যে, উল্লিখিত দুই ওয়াক্তে হুযুর (সা) অনুসৃত মুস্তাহাব ওয়াক্ত হওয়ার পর আর দেরী করা উচিত নয়। অন্যান্য ওয়াক্ত যেমন, মাগরিবের সময়ে প্রথম ওয়াক্তেই নামায পড়ে নেওয়া উত্তম।

মোটকথা, এ আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর শরীয়তের দৃষ্টিতে অথবা প্রকৃতিগত কোন বাধার সৃষ্টি না হলে নামায পড়তে দেরী করা উচিত নয়, প্রথম ওয়াক্তে পড়ে নেওয়াই উত্তম। যেসব নামায কিছুটা

দেরী করে পড়তে হুযুর (সা) নির্দেশ দিয়েছেন বা নিজে আমল করেছেন কিংবা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অসুবিধার কারণে দেরী করতে হয়, শুধুমাত্র সেগুলোতে কিছুটা দেরী করা যেতে পারে।

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

(১৫১) যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন ; আর তোমাদের শিক্ষা দিবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দিবেন এমন বিষয়, যা কখনো তোমরা জানতে না। (১৫২) সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কা'বাগৃহ নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম (আ) যেসব দোয়া করেছিলেন, কা'বাকে কেবলা নির্ধারণের মাধ্যমে আমি তা কবুল করেছি) যেভাবে (কবুল করেছি একজন রসূল প্রেরণ সম্পর্কিত দোয়া।) তোমাদের মধ্যে আমি একজন (মহান) রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি (যিনি) তোমাদেরই একজন। তিনি আমার আয়াত (নির্দেশ)-সমূহ পাঠ করে তোমাদের শুনিয়ে থাকেন এবং (জাহেলী যুগের ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ থেকে) তোমাদিগকে পবিত্র করেন এবং তোমাদিগকে (আল্লাহ্‌র) কিতাব ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় বলে দেন। তিনি তোমাদিগকে এমন (উপকারী) বিষয়াদি শিক্ষা দেন, যেসব বিষয় সম্পর্কে তোমরা কিছুই জানতে না (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও যে সম্পর্কে কোন তথ্য দেওয়া হয়নি। এভাবে একজন রসূল প্রেরণ করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) যে দোয়া করেছিলেন, তারই বাস্তব প্রকাশ হয়ে গেলো)। এসব (উল্লিখিত) নেয়ামত-সমূহের জন্য আমাকে (যেহেতু আমিই তা দান করেছি) স্মরণ কর। আমিও তোমাদিগকে (অনুগ্রহের মাধ্যমে) স্মরণ রাখব। আর আমার (নেয়ামতসমূহের) শোকরগুযারী কর এবং (নেয়ামত অস্বীকার করে বা আনুগত্য পরিহার করে আমার প্রতি) অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ পর্যন্ত কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী (সা)-র আবির্ভাব। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা)-এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তাঁর কেবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই।

كَمَا أَرْسَلْنَا —বাক্যে উদাহরণসূচক যে 'কাফ' (ک) বর্ণটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটি ব্যাখ্যা তো উল্লিখিত তফসীরের মাধ্যমেই বোঝা গেছে। এ ছাড়াও আরেকটি বিশ্লেষণ রয়েছে, যা কুরতুবী গ্রহণ করেছেন। তা হল এই যে, 'কাফ'-এর সম্পর্ক হল পরবর্তী আয়াত فَاذْكُرُونِي -এর সাথে। অর্থাৎ, আমি যেমন তোমাদের প্রতি কেবলাকে একটি নেয়ামত হিসাবে দান করেছি এবং অতঃপর দ্বিতীয় নেয়ামত দিয়েছি রসূলের আবির্ভাবের মাধ্যমে, তেমনি আল্লাহ্‌র যিকিরও আরেকটি নেয়ামত। এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যাতে এসব নেয়ামতের অধিকতর প্রবৃদ্ধি হতে পারে। কুরতুবী বলেন, এখানে كَمَا أَرْسَلْنَا ---এর 'কাফ'টির ব্যবহার ঠিক তেমনি, যেমনটি সূরা আনফালের كَمَا أَخْرَجَكَ এবং সূরা হিজর-এর كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ -এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ —এতে 'যিকির'-এর অর্থ হল স্মরণ করা, যার সম্পর্ক হল অন্তরের সাথে। তবে জিহবা যেহেতু অন্তরের মুখপাত্র, কাজেই মুখে স্মরণ করাকেও 'যিকির' বলা যায়। এতে বোঝা যায় যে, মৌখিক যিকিরই গ্রহণযোগ্য, যার সাথে মনেও আল্লাহ্‌র স্মরণ বিদ্যমান থাকবে। এ প্রসঙ্গেই মওলানা রুমী বলেছেন ঃ

برزبان تسبیح دردل گاؤ وخر
ایں چنیں تسبیح کے دارد اثر

অর্থাৎ, মুখে থাকবে তসবীহ্; আর মনে থাকবে গরু-গাধার চিন্তা, এমন তসবীর ক্রিয়া কি হবে?

তবে এতদসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন লোক যদি মুখে তসবীহ্

জপে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার মন যদি অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ যিকিরে না লাগে, তবুও তা একেবারে ফায়দাহীন নয়। হযরত আবু ওসমান (র)-এর কাছে জনৈক ভক্ত এমনি অবস্থায় অভিযোগ করেছিল যে, মুখে মুখে যিকির করি বটে, কিন্তু অন্তরে তার কোনই মাধুর্য অনুভব করতে পারি না। তখন তিনি বললেন, তবুও আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় কর যে, তিনি তোমার একটি অঙ্গ---জিহ্বাকে তো অন্তত তাঁর যিকিরে নিয়োজিত করেছেন।---(কুরতুবী)

যিকিরের ফযীলত ঃ যিকিরের ফযীলত অসংখ্য। তন্মধ্যে এটাও কম ফযীলত নয় যে, বান্দা যদি আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তাহলে আল্লাহ্ তাকে স্মরণ করেন। আবু ওসমান মাহদী (র) বলেছেন, আমি সে সময়টির কথা জানি, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে স্মরণ করেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি তা কেমন করে জানতে পারেন? বললেন, তা এজন্য যে, কোরআন করীমের ওয়াদা অনুসারে যখন কোন মু'মিন বান্দা আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্ নিজেও তাকে স্মরণ করেন। কাজেই বিষয়টি জানা সবার জন্যই সহজ যে, আমরা যখন আল্লাহ্র স্মরণে আত্মনিয়োগ করব, আল্লাহ্ তা'আলাও আমাদের স্মরণ করবেন।

আর আয়াতের অর্থ হল এই যে, তোমরা যদি আমাকে আমার হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে সওয়াব ও মাগফেরাত দানের মাধ্যমে স্মরণ করব।

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রা) 'যিকরুল্লাহ্'র তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যিকিরের অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মান্য করা। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে ঃ

فمن لم يطعه لم يذكره وان كثر صلوته وتسبيحه ০

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহ্র যিকিরই করে না, প্রকাশ্যে যত বেশী নামায এবং তসবীহ্ই সে পাঠ করুক না কেন।

যিকিরের তাৎপর্য ঃ মুফাস্সির কুরতুবী ইবনে-খোয়াইয-এর আহকামুল কোরআনের বরাত দিয়ে এ সম্পর্কিত একখানা হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে যে, রসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করে অর্থাৎ তাঁর হালাল ও হারাম সম্পর্কিত নির্দেশগুলোর অনুসরণ করে, যদি তার নফল নামায-রোযা কিছু কমও হয়, সে-ই আল্লাহ্কে স্মরণ করে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে সে নামায-রোযা, তসবীহ্-তাহলীল প্রভৃতি বেশী করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্কে স্মরণ করে না।

হযরত যুন্নুন মিসরী (র) বলেন, "যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহ্কে স্মরণ করে, সে অন্য সব কিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই সবদিক দিয়ে তাকে হেফাযত করেন এবং সব কিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন।"

হযরত মু'আয (রা) বলেন, "আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে

মানুষের কোন আমলই যিকরুল্লাহ্‌র সমান নয়।" হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে-কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি।"

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

(১৫৩) হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

যোগসূত্র ঃ কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে ব্যাপক সমালোচনা চলছিল। ফলে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। প্রথমত, নানা রকম জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করে ইসলামের সত্যতার উপর আঘাত এবং মুসলমানদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছিল। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব কূট-প্রশ্নের জবাব দিয়ে সেগুলোকে প্রতিহত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ওদের তরফ থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন যুক্তিপূর্ণ জওয়াব দেওয়ার পরও যেহেতু আরো নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপন এবং তর্কের পর তর্কের অবতারণা করে মুসলমানদের মন-মস্তিষ্ককে বিষাক্ত করে তোলার ষড়যন্ত্র চলছিল, সেহেতু এ আয়াতে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আত্মিক শক্তি অর্জন করে সে সব আঘাতের মোকাবেলা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সারসংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! (মানসিক আঘাত ও দুশ্চিন্তার বোঝা হালকা করার লক্ষ্যে) ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা (সর্ব বিষয়েই) ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন, বিশেষত নামাযীগণের সাথে তো তিনি অবশ্যই থাকেন। কেননা নামায হল সর্বোত্তম ইবাদত। ধৈর্য ধারণের ফলেই যদি আল্লাহ্ তা'আলা সঙ্গী হন, তবে নামাযের মধ্যে তো এ সুসংবাদ আরো প্রবলতর হওয়াই স্বাভাবিক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধৈর্য ও নামায যাবতীয় সংকটের প্রতিকার ঃ اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

"ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর"—এ আয়াতে বলা হয়েছে

যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকটের নিশ্চিত প্রতিকার দু'টি বিষয়ের মধ্যে নিহিত। একটি 'সবর' বা ধৈর্য এবং অন্যটি 'নামায'। বর্ণনা-রীতির মধ্যে اِسْتَعِيْنُوْا শব্দটিকে বিশেষ কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার ফলে এখানে যে মর্মার্থ দাঁড়ায়, তার মর্ম হচ্ছে এই যে, মানব জাতির যে কোন সংকট বা সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকার হচ্ছে ধৈর্য ও নামায। যে কোন প্রয়োজনেই এ দু'টি বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে পারে। তফসীরে মাযহারীতের শব্দ দু'টির ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের তাৎপর্য এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত স্বতন্ত্রভাবে দু'টি বিষয়েরই তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে।

সবর-এর তাৎপর্য ঃ 'সবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযম অবলম্বন ও নফস্-এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা।

কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'সবর'-এর তিনটি শাখা রয়েছে ঃ (এক) নফসকে হারাম ও না-জায়েয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা, (দুই) ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং (তিন) যে কোন বিপদ ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করা অর্থাৎ যে সব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহ্র বিধান বলে মেনে নেওয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোন কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায় কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়, তবে তা 'সবর'-এর পরিপন্থী হবে না---(ইবনে কাসীর, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে)

'সবর'-এর উপরিউক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় তিনটি কর্তব্য। সাধারণ মানুষের ধারণায় সাধারণত তৃতীয় শাখাকেই সবর হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রথম দু'টি শাখা যে এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমন কি এ দু'টি বিষয়ও যে 'সবর'-এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই।

কোরআন-হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্য ধারণকারী বা 'সাবের' সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরিউক্ত তিন প্রকারেই 'সবর' অবলম্বন করে থাকেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, "ধৈর্য ধারণকারীরা কোথায় ?" এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। এসব লোককে প্রথমই বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। 'ইবনে-কাসীর' এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে, কোরআনের অন্যত্র ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুরস্কার বিনা হিসাবে প্রদান করা হবে। এ আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

নামায ঃ মানুষের যাবতীয় সমস্যা ও সংকট দূর করা এবং যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে কোরআন-উল্লিখিত দ্বিতীয় পন্থাটি হচ্ছে নামায।

'সবর'-এর তফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার ইবাদতই সবরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এরপরও নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যে, নামায এমনই একটি ইবাদত, যাতে 'সবর' তথা ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা বিদ্যমান। কেননা নামাযের মধ্যে একাধারে যেমন নফস তথা রিপুকে আনুগত্যে বাধ্য রাখা হয়, তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, নিষিদ্ধ চিন্তা, এমন কি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও সরিয়ে রাখা হয়। সেমতে নিজের 'নফস'-এর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সর্বপ্রকার গোনাহ্ ও অশোভন আচার-আচরণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজেকে আল্লাহ্র ইবাদতে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে 'সবর'-এর যে অনুশীলন করতে হয়, নামাযের মধ্যেই তার একটা পরিপূর্ণ নমুনা ফুটে উঠে।

যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভ করার ব্যাপারে নামাযের একটা বিশেষ 'তাছীর' বা প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ রোগে কোন কোন ওষধী গুল্ম-লতা ও ডাল-শিকড় গলায় ধারণ করায় বা মুখে রাখায় যেমন বিশেষ ফল লক্ষ্য করা যায়, লোহার প্রতি চুম্বকের বিশেষ আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক, কিন্তু কেন এরূপ হয়, তা যেমন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না, তেমনি বিপদ-মুক্তি এবং যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে নামাযের তাছীরও ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যথাযথ আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করলে যেমন বিপদমুক্তি অবধারিত, তেমনি যে কোন প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারেও এতে সুনিশ্চিত ফল লাভ হয়।

হুযুর (সা)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, যখনই তিনি কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখনই তিনি নামায আরম্ভ করতেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা সে নামাযের বরকতেই তাঁর যাবতীয় বিপদ দূর করে দিতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে---

اذا حزبه امر فزع الى الصلوة

অর্থাৎ মহানবী (সা)-কে যখনই কোন বিষয় চিন্তিত করে তুলত, তখনই তিনি নামায পড়তে শুরু করতেন।

আল্লাহ্র সান্নিধ্য ঃ নামায ও 'সবর'-এর মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ দু' পন্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়।

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

বাক্যের দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, নামাযী এবং সবরকারিগণের সাথে আল্লাহ্র সান্নিধ্য তথা খোদায়ী শক্তির সমাবেশ ঘটে। যেখানে বা যে অবস্থায় বান্দার সাথে আল্লাহ্র শক্তির সমাবেশ ঘটে, সেখানে দুনিয়ার কোন শক্তি কিংবা কোন সংকটই যে টিকতে পারে না, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। বান্দা যখন

আল্লাহ্‌র শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মত শক্তি কারও থাকে না। বলা বাহুল্য, মকসুদ হাসিল করা এবং সংকট উত্তরণের নিশ্চিত উপায় একমাত্র আল্লাহ্‌র শক্তিতে শক্তিমান হওয়াই হতে পারে।

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن
لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

(১৫৪) আর যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা' বোঝ না। (১৫৫) এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের—(১৫৬) যখন তারা বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। (১৫৭) তারা সে সব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে একটা বিশেষ প্রতিকূল অবস্থায় সবর করার তালীম এবং ধৈর্য ধারণকারীদের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছিল। এ আয়াতে অনুরূপ আরো কতিপয় অসুবিধাজনক অবস্থার বিবরণ দিয়ে সেসব অবস্থাতেও সবর করার উৎসাহ দান এবং সে পরিস্থিতিতেও সবর করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। সে অবস্থাগুলোর মধ্যে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহের বিষয়টি সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হচ্ছে এ কারণে যে, পরীক্ষার এ অবস্থাটাই সর্বাপেক্ষা বেশী বিপজ্জনক ও গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যারা এ অবস্থার মোকাবেলা করতে পারবে, তারা স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও হালকা বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে সমর্থ হবে। দ্বিতীয়ত, যারা মুসলমানদের সাথে কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে বিতর্কের অবতারণা করছিল, এ বিপদ তাদের মোকাবেলাতেই যেহেতু দেখা দেবে, সেহেতু এটি সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয়েছে।

তফসীরের সারসংক্ষেপ

আর যেসব লোক আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ দ্বীনের জন্য) নিহত হয় (তাদের ফযীলত এমন যে,) তাদের মৃত বলো না। বরং এসব লোক (একটা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ জীবনের সাথে) জীবিত, কিন্তু তোমরা (তোমাদের বর্তমান অনুভূতিতে সে জীবন সম্পর্কে) অনুভব করতে পার না। এবং আমি (আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের সন্তুষ্টি এবং আত্মসমর্পণের গুণ সম্পর্কে যা ঈমানেরই লক্ষণ) তোমাদের পরীক্ষা গ্রহণ করব, কিছুটা ভয়ে নিপতিত করে (যা তোমাদের শত্রুদের সংখ্যাধিক্য অথবা উপর্যুপরি আপদ-বিপদের মাধ্যমে) এবং কিছুটা (দারিদ্র্য ও) ক্ষুধায় নিপতিত করে (কিছুটা) জান-মান ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে (যথা ঃ পশুমড়ক, মানুষের মৃত্যু, রোগজরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফল-ফসলের ক্ষতি সাধন করে। এমতাবস্থায়) তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর। (যারা এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং অটল থাকে,) আপনি সে সব সবরকারীকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন (যাদের রীতি হচ্ছে যে,) তাদের উপর যখন কোন বিপদ আসে, তখন তারা (অন্তরে অনুভব করে এরূপ) বলে যে, আমরা (আমাদের ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততিসহ প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ্‌ তা'আলারই মালিকানাধীন। (প্রকৃত মালিকের তো তাঁর সম্পদে যে কোন হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে, এতে মালিকানাধীনদের পক্ষে উদ্বিগ্ন হওয়া অর্থহীন।) এবং আমরা সবাই (এ দুনিয়া থেকে) আল্লাহ্‌র নিকটই ফিরে যাবো (এখানকার ক্ষতির বদলা সেখানে গিয়ে অবশ্যই আমরা পাবো)। বস্তুত সুসংবাদের যে কথা তাদের শোনানো হবে, তা হচ্ছে এই যে, এসব লোকের প্রতি (স্বতন্ত্রভাবে) তাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে বিশেষ রহমত (প্রদত্ত) হবে এবং সবার প্রতিই (সমষ্টিগতভাবে) ব্যাপক রহমত হবে। আর এসব লোকই তারা, যারা (প্রকৃত অবস্থায়) হেদায়েতের (যথার্থ মর্যাদার) স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হবে। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলাই যে প্রকৃত মালিক এবং সমস্ত ক্ষতি পূরণ করার অধিকারী—একথা তারা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলমে-বরযখে নবী এবং শহীদগণের হায়াত ঃ ইসলামী রেওয়ায়েত মোতাবেক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি আলমে-বরযখে বিশেষ ধরনের এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আযাব বা সওয়াব অনুভব করে থাকে—একথা সবাই জানেন। এই জীবন প্রাপ্তির ব্যাপারে মু'মিন, কাফির এবং পুণ্যবান ও গোনাহগারের কোন পার্থক্য নেই। তবে বরযখের এ জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক স্তরে সর্বশ্রেণীর লোকই সমানভাবে শরীক। কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী-রসূল এবং বিশেষ নেককার বান্দাদের জন্য নির্ধারিত। এ স্তরেও অবশ্য বিশেষ পার্থক্য এবং পরস্পরের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে আলেমগণ বিস্তর আলোচনা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে কোরআন ও সুন্নাহর তথ্যের সাথে সর্বাপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)। সুতরাং তাঁর রচিত বয়ানুল-কোরআনের আলোচনাটুকু উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট বলে মনে করছি।